বাবু ও তাঁর রক্ষিতা, কালিঘাটের পট, উনিশ শতক

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

হরিদাসের গুপ্তকথা অতি আশ্চর্য্য!

আমি কে?

আমি হরিদাস। বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই বাঙ্গালাদেশেই ছিলাম। সেই সময় আমার বাল্যজীবনের কতক কতক পরিচয় দিয়াছি। জন্মাবধি কতদিন পর্য্যন্ত মাতাপিতা জানিতাম না, আপন বলিয়া কাহাকেও চিনিতাম না, নানা স্থানে বিচরণ করিয়া কত কষ্টই ভোগ করিয়াছিলাম, কত বিপদেই পড়িয়াছিলাম, তাহা মনে হইলে এখনও আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সহিত জীবাত্মা শিহরিয়া ওঠে। ভাগ্যক্রমে যদিও এখন আমি রাজা, তথাপি পূর্ব্বের অবস্থার সমস্ত কথাই আমার মনে আছে।

জীবনকাহিনীগুলি প্রণালীপূর্ব্বক বর্ণনা করিতে হইলে এতদ্দেশের প্রচলিত কথোপকথনের সহজ ভাষাই ব্যবহার করা ভাল; কেন না, সেই ভাষায় গল্পচ্ছলে লিখিয়া দিলে আপামর সাধারণ সকলেরই হৃদয়গ্রাহিণী হয়। এই আখ্যায়িকাতে সেই ভাষাই আমি অবলম্বন করিব। পূর্ব্বে একবার কতক কতক পরিচয় দিয়াছিলাম, বয়স তখন অল্প ছিল, আমার অনেক গুহ্যকথা তখন আমি ব্যক্ত করিতে পারি নাই, এইবার শেষের কথাগুলির সঙ্গে সেইগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোলসা করিয়া বলিব। গোড়ার কথাগুলি

সংকলন ও ভূমিকা : আবুল আহসান চৌধুরী

বাঙালির গুপ্তকথার অন্ত নেই। পতিত-পতিতার গুপ্তকথা, পীর-মোহন্তের গুপ্তকথা, ভাশুর-ভাদ্রবধূর গুপ্তকথা, জামাই-শাশুড়ির গুপ্তকথা, নফর-মালকিনের গুপ্তকথা, বাবু-বিবির গুপ্তকথা—এসব কেচ্ছা সবই যে বানানো, তা নয়। কখনো কখনো নিজের অভিজ্ঞতা—বাস্তব ঘটনার সঙ্গে উদার কল্পনার মিশেলে গড়ে ওঠে এই কাহিনি। আবার কখনো বা কোনো সমকালীন ঘটনার কথাও উঠে আসে আখ্যায়িকা বা নকশাধর্মী রচনায়। গল্পের এই সব কাঁচামাল নিয়ে কাহিনি নির্মাণের কারবারের কিছু খলিফা মসিজীবী উনিশ শতকে বেশ রমরমা ব্যবসা ফেঁদেছিলেন। এঁদের কেউ কেউ ছিলেন ফরমায়েশি লেখক—আবার দু-চারজন জাতলেখকও এই কাজে হাত পাকিয়েছিলেন। আদিরসের এই সব কেচ্ছা-কাহিনির জন্মস্থানের নাম 'বটতলা'। ঝাঁকা-মুটের দল *পাস করা মাগ, বেশ্যারহস্য, কমলিনীর মধুচাক, ছোট বউর*

বাকি অংশ ২৯৫ পৃষ্ঠায়

না বলিলে আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ থাকে, অতএব প্রয়োজনীয় ঘটনাবলীও সংক্ষেপে সংক্ষেপে ইহাতে লিপিবদ্ধ থাকিল। পাঠকমহাশয়! অনুগ্রহপূর্ব্বক অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন।

পরামর্শ

সন্ধ্যা হলো। পল্লীগ্রামের সন্ধ্যাকাল। সহরের সন্ধ্যাকালের ন্যায় রাজমার্গগুলি আলোয় মণ্ডিত হয় না, জনকোলাহল বাড়ে না, ঢোলকতবলা বাজে না, স্বরলহরী উঠে না, পাহারার আঁটা-আঁটি হয় না, চোর-গাঁটকাটা ঘোরে না, গাড়ী-ঘোড়াও ছোটে না, এ প্রকার কিছুই হয় না,—পল্লীগ্রামের সন্ধ্যাকালে অন্ধকার হয়, নক্ষত্র উঠে, শেয়াল ডাকে, সকলে ঘরে যায়, ঘরে ঘরে সন্ধ্যা জ্বালে, ভক্তগৃহে শঙ্খধ্বনি হয়, দুই একটী দেবগৃহে আরতির সময় শঙ্খঘণ্টা বাজে, পল্লী নিস্তব্ধ হয়, প্রকৃতি নিদ্রা যান, পাখীরা আলয় অন্বেষণ করে, পশুরা খোয়াড়ে গহ্বরে আশ্রয় লয়, এই সকল লইয়াই পল্লীগ্রামের সন্ধ্যা। সেই সন্ধ্যাকালে আমি হুগলী জেলার সপ্তগ্রামের এক বকুলতলায়। আমার ভাগ্যক্রমে সে দিন শুক্লপক্ষের দশমী তিথি ছিল, আকাশে চন্দ্রোদয় হলো,—দিব্য জ্যোৎস্না। বকুলপল্লব ভেদ কোরে চন্দ্রদেব আমার অঙ্গে অল্প অল্প শীতল কিরণ বর্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেন, আমি আকাশপানে চাইলেম; চন্দ্রদেবকে দর্শন কোল্লেম। আকাশ আমি দেখ্‌বো, চন্দ্রদেবকেও দেখ্‌বো, আবার সন্ধ্যাকাল আসবে, কিন্তু সপ্তগ্রামের এই আকাশ, এই চন্দ্র আর আমি দেখ্‌তে পাব না! গুরুঠাকুরাণীর যে প্রকার ভাব, তাতে কোরে এই রাত্রেই হয় তো আমাকে সপ্তগ্রাম-ছাড়া হোতে হবে! যে লোকটাকে বাড়ীর ভিতর দেখ্‌লেম, ঐ লোকটার হাতেই হয় তো আমার ভাগ্যচক্রের নূতন ঘূর্ণন আরম্ভ হবে! আশাভরসার বিসর্জ্জন হয়ে যাবে। কি যে হবে, কিছুই তখন ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। আগাগোড়া অনেক ভাব্‌লেম মীমাংসা পেলেম না।

রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড। গুরুপত্নী ফিরে এলেন না। একা আমি এতক্ষণ বৃক্ষতলে বোসে তাঁর আজ্ঞা পালন কোচ্চি, এটা হয় তো তিনি ভুলে গেছেন। রাত্রি অন্ধকার থাক্‌লে আমার ভয় হোতো, জ্যোৎস্নাটুকু সহায় আছে বোলে ততটা ভয় আসছে না, এক-রকমে আছি ভাল। হঠাৎ একদিক্ থেকে তিনটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন্য শৃগাল আমার সম্মুখ দিয়ে ভোঁ ভোঁ কোরে নক্ষত্রবেগে ছুটে গেল।

এ সংসারে দুঃসময়ে আপন মুখে সুখের কথা বোল্‌তে নাই। ভাল আছি বোল্‌তে বোল্‌তেই সম্মুখ দিয়ে শেয়াল ছুটে গেল!— শেয়াল ছুটে গেল, পাছে আবার বাঘ ছুটে যায়, সেই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি উঠে, টোলমহলের দরজার কাছে ছুটে গেলেম। ঠাকুরাণীর নির্দেশ-নির্ব্বন্ধ বিস্মৃত হোলেম। আস্তে আস্তে দরজাটা একটু ফাঁক কোরে, বাড়ীর ভিতর এদিক্ ওদিক্ উকি মেরে দেখ্‌লেম উত্তরদিকের ঘরে প্রদীপ জ্বোলছে; দ্বার আবৃত আছে; জানালার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে; দুটী লোক বেশ ডেকে ডেকে কথা কোচ্ছেন।—কে সেই দুটী লোক, একবার দেখেই তৎক্ষণাৎ নিঃসন্দেহে আমি তা বুঝতে পাল্লেম। [...]

ঘরে দর্ম্মার বেড়া। একদিকে আমি, একদিকে তাঁরা দুজন। ব্যবধান একখানি পাত্‌লা দর্ম্মা মাত্র। কথাগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট আমার কানে আসতে লাগ্‌লো। [...]

কথা কইতে কইতে হঠাৎ দুজনেই একবার থেমে গেলেন। একটু পরেই আবার হাস্যের কলরব উঠ্‌লো। ভাল কোরে গলা শাণিয়ে লোকটা তখন নূতন রকম কথা তুল্লে। দর্ম্মার গায়ে নিঃশব্দে আমি কাণ পেতে থাকলেম। লোকটা বল্লে, "চেহারাটা আছে ভাল; চেহারার চটোকে বুঝা যায়, বুদ্ধিটাও ভাল, বেশ মোটাসোটাও আছে, কিন্তু খাটে না, খাট্‌তে পারে না, তোমার মুখে এই কথাটা শুনে আমার কেমন কেমন বোধ হোচ্ছে; রোগমাখা মাংসপিণ্ড নিয়ে আমি কি কোর্‌বো?"

ঠাকুরাণী বোল্লেন, "খাট্‌তে পারে না, এমন কথা আমি বলি নাই, তবে কি জান, কর্ত্তার আদর পেয়ে ও কেমন একরকম নাই পেয়ে গিয়েছে; কর্ত্তার আদরে আমারও আদর পেয়েছিল, কাজে কাজেই কুড়ে বোনে গেছে; খাটালেই খাট্‌বে,—ঘাড়ের উপর চাপ পোড়লে সকলকেই খাটুনী অভ্যাস কোত্তে হয়। তুমি এক কাজ কর। আজ আর নয়, কাল্‌কের দিনটেও থাক্, পরশুদিন বিকেলবেলা তুমি এসো, আমি ওটাকে তোমার সঙ্গে বিদায় কোরে দিব।" [...]

আমার গা কেঁপে উঠ্‌লো। আমার গুরুপত্নী আমাকে এই লোকটার হাতেই সোঁপে দিবেন, এই লোক আমাকে চাষের কাজে নিযুক্ত কর্‌বে। কোথায় যে নিয়ে যাবে, কে বোল্‌তে পারে? চাষের কাজে দুদিনেই আমি মারা যাব! হায় হায়! আমার ভাগ্যে যে কি আছে, ভাগ্যলিপির যিনি কর্ত্তা, সেই বিধাতাপুরুষ ভিন্ন আর কেহই সে তত্ত্ব পরিজ্ঞাত নয়। ভাগ্য আমার বড়ই মন্দ। তা যদি না হবে, জন্মাবধি নিরাশ্রয় হয়েও একটা আশ্রয় পেয়েছিলেম, অকস্মাৎ সে আশ্রয়টীও হারাব কেন? আমার ভাগ্যের কথা নিয়ে এরা আমোদ কোরে হাসিখুসী কোচ্চে, এটাও আমার ভাগ্যের ফল! হায় হায়! মানুষের মন বুঝে উঠা মানুষের অসাধ্য! এই গুরুগৃহিণীকে আমি মায়ের সমান দেখ্‌তেম; এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি, তা তো নয়, ইনি একটী মায়ারাক্ষসী। মনে এই সব আলোচনা কোরে সেইখানে দাঁড়িয়ে আমি তিনটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেম। [...]

দুজনে আবার চুপি চুপি কি বলাবলি কোরে দু-একবার আমার নাম কোল্লে,

২৯৪ পৃষ্ঠার পর

বোম্বাচাক, রমণীরঞ্জন, সচিত্র রতিশাস্ত্র, শাশুড়ি-জামাই, গুপের শ্বশুর, রাতে উপুড় দিনে চিৎ ছোট বউর এ কি রীত এবং এর সঙ্গে নানা গুপ্তকথার কেচ্ছার কেতাব মাথায় তুলে ফেরি করে বেড়াত—রসিক জনেরা কখনো এর কদর করতে ভোলেননি। পড়তে জানা অন্তঃপুরবাসিনীরাও কি আর লুকিয়ে-চুরিয়ে এর স্বাদ গ্রহণ করেননি?

সেকালে জানা-অজানা বটতলার অনেক বাজারি লেখকের আবির্ভাব হয়েছিল। কেউ কেউ নামও কিনেছিলেন বেশ। এঁদের বইয়ের বিক্রিবাট্টা যে মন্দ ছিল না, তা বেশ বোঝা যায় সংস্করণের হিসাবে। ওই যে বলেছি, দু-একজন মেধাবী লেখকও ভিড়েছিলেন বটতলার লেখকের দলে—এঁদেরই একজন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২—১৯১৬), *হরিদাসের গুপ্তকথা* (১৩১০/১৯০৪) তাঁরই লেখা বই।

সেকালের রেওয়াজ অনুসারে ভুবনচন্দ্র জন্মেছিলেন চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ বারুইপুরের কাছে শাসন গ্রামে, মায়ের বাপের বাড়িতে। মূলত অভাবের কারণেই স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে পড়ার সুযোগ তাঁর হয়নি। তাই জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে সামান্য কিছুদিন স্কুলমাস্টারি আর গৃহশিক্ষকতার কাজ করেন। এরপর তাঁর জীবনের ধারা বদলে যায়, সাহিত্যচর্চা আর সাংবাদিকতাই হয়ে ওঠে নেশা আর পেশা। তিনি *পরিদর্শক, সোমপ্রকাশ* ও *সংবাদ প্রভাকর*—এই সব পত্রপত্রিকার সহসম্পাদক ছিলেন। এ ছাড়া *বিদূষক, পূর্ণশশী, বসুমতী* ও *জন্মভূমি* পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেন। সাহিত্যচর্চায় তাঁকে সব্যসাচী লেখক হিসেবে অনায়াসে চিহ্নিত করা চলে। জানা যায়, 'তিনি কাব্য, গল্প-উপন্যাস, সামাজিক নকশা, প্রহসন, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী—এককথায় বাংলা সাহিত্যের সব বিভাগেই কিছু না কিছু লিখেছেন' (*সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা*, অষ্টম খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৫৮)। তাঁর কাব্য-কবিতার মধ্যে আছে *মধু-বিলাপ* (১৮৭৩), *আমি রমণী* (১৮৮১), *তুমি কে?* (১৮৮৭)। সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস বা 'নবন্যাস'ও লিখেছেন : *তুমি কি আমার?* (১৮৭৩—৭৯), *রহস্য-মুকুর* (১৮৭৭-৭৮), *ছোট বউ* (১৮৮৫), *আমার মহিষী* (১৮৮৭), *কুঞ্জবালা* (১৮৯০), *কমলকুমারী ও রাজা সন্ন্যাসী* (১৮৯১), *পারুল বা সেই কি তুমি?* (১৮৯৩), *অগ্নিকুমারী* (১৮৯৪), *আনন্দ-লহরী* (১৮৯৪), *আমিনা বাই* (১৯০২), *বাবু-চোর* (১৯০৬), *সংসার-সাগর* (১৯১২), *প্রেমের বাজার* (১৯১২), *বিলাতী ভূত* (১৯১৫), *জেলখানা* (১৯১৯)। বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে তিনি বেশ কয়েকটি উপন্যাস ও গোয়েন্দা-আখ্যান রচনা করেন : *মার্কিন পুলিস কমিশনার* (১৮৯৬), *গুপ্তচর* (১৮৯৮), *ঠাকুরবাড়ীর দপ্তর* (১৯০০), *চন্দ্রমুখী* (১৯০২), *সন্তপ্ত সয়তান*

বাকি অংশ ২৯৬ পৃষ্ঠায়

আবার খানিকক্ষণ চুপ কোরে থাক্‌লে; তারপর লোকটা ইতস্তত কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আচ্ছা, আজ নিয়ে যেতে তুমি বারণ কোচ্চো কেন?" ঠাকুরাণী বোল্লেন, "[...] খুব ছোটবেলা থেকে এখানে রয়েছে, মায়ার সংসার বেড়াল-কুকুরের উপরেও একটু একটু মায়া বসে, তার কান্না দেখে আমারও একটু মায়া হয়েছিলো, সেইজন্য তাকে গাছতলায় বোসিয়ে আমি এখানে চোলে এসেছি। আমার পায়ে ধোরে কতই কেঁদেছে, কতই সাধনা কোরেছে, আমার চক্ষেও জল এসেছিলো, তাই জন্যে বলা, এ দু-দিন থাক্, পরশুদিন তুমি নিয়ে যেয়ো।"

হো হো কোরে হেসে লোকটা বোল্লে, "ও হো হো! এই কথা তোমার! এত মায়া তোমার! [...] ও মায়াতে তুমি ভুল্‌তে পার, আমি ভুলি না। আজ রাত্রেই আমি নিয়ে যাব। রাত্রিকালে নিয়ে যাওয়াই ভাল। কোন দিক্ দিয়ে কোথায় নিয়ে ফেল্‌বো, পথ চিনে আর ফিরে আস্‌তে পার্‌বে না। মল্লিকবাবুদের নদীয়াজেলার নীলকুঠীতে।" [...]

আর আমার সেখানে লুকিয়ে থাক্‌বার সাহস হোলো না। গুরুঠাকুরাণী আগে গিয়ে যদি দেখেন, সেখানে আমি নাই, তা হোলে বিপদ্ হবে! [...] আজ রাত্রে যদি রক্ষা পাই, তা হোলে ঐ সময়ের মধ্যে অবসর বুঝে যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকেই আমি পালিয়ে যেতে পার্‌বো, রাক্ষসীর কাছেও থাক্‌তে হবে না, রাক্ষসের কবলেও পোড়্‌তে হবে না। এই স্থির কোরে চুপি চুপি সেই গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে অলক্ষিতে আমি সেই বকুলতলায় গিয়ে চুপটী কোরে বোসে থাক্‌লেম। আকাশে উজ্জ্বল চন্দ্র, ধরাতলে দিব্য জ্যোৎস্না।

সব নূতন

ভূমিষ্ঠ হবার পর ক্রমশঃ জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিশু যেমন জগৎ-সংসারের সমস্ত পদার্থই নূতন দেখে, বর্দ্ধমানে সর্ব্বানন্দবাবুর পবিত্র আশ্রমে আশ্রয় পেয়ে আমিও সেইরূপ সমস্ত পদার্থই নূতন দেখতে লাগলেম। যা যা দেখি, সমস্তই নূতন জগৎ। সব নূতন। কর্ত্তার অনুমতি নিয়ে মধ্যে মধ্যে আমি নগরদর্শনে বাহির হই। এক একদিন এক একজন লোক সঙ্গে থাকে, এক একদিন আমি একা। নগরের পথ, ঘাট, দোকান, পসার, বাজার, লোকালয়, আদালত, একে একে দর্শন করি, সব যেন চমৎকার বোধ হয়। বর্দ্ধমানে এক মহারাজা থাকেন, মহারাজের সম্পদ্‌সমৃদ্ধি দেশবিখ্যাত। মহারাজের আসবাবপত্র সমস্তই সুন্দর সুন্দর। একে একে অনেকগুলি আমার দেখা হলো। রাজবাড়ী, রাজগাড়ী, রাজঠাকুর, রাজবাগিচা, রাজবানর, রাজতুরঙ্গ, রাজমাতঙ্গ, রাজমৎস্য, রাজবাদ্য, রাজসিপাহী, রাজসাগর, রাজ-পশুশালা, কৌতুকে কৌতুকে আমি সব দর্শন কোল্লেম। সকলগুলিই আশ্চর্য্য! মহারাজের চেহারা কেমন, অনেক দিন আমি দেখ্‌তে পাই নাই; একদিন অপরাহ্নে জনাকীর্ণ রাজপথে রাজমূর্ত্তি আমি দর্শন কোরেছিলেম। বর্দ্ধমানের মহারাজ। শুনতেও যেমন নামটী জমকালো, চেহারাও তদ্রূপ মনোহর; যেমন রূপ, তদুপযুক্ত বেশভূষা, তদুপযুক্ত গাড়ী-ঘোড়া, তদুপযুক্ত অনুচর-রেসালা। মহারাজকে যুগলহস্তে নমস্কার কোরে সেইদিন আমি আমাকে চরিতার্থ মনে কোরেছিলেম। কমলার কৃপায় মহারাজের সমস্তই পরম সুন্দর।

রাজপথে আমি বেড়াই, দিন দিন কত কি দেখি, সকলগুলির নাম জানি না, কিন্তু দেখে দেখে বড় আমোদ হয়।— না না, বোল্‌তে আমার ভুল হোচ্ছে; সকলগুলি দেখে আমোদ হয় না। যেখানে জনতা অধিক, সেখানে ভাল-মন্দ সব রকম দেখা যায়, সুদৃশ্য-কুদৃশ্য, উৎকট-বিকট, নানা প্রকার জীবপ্রবাহ নয়নগোচর হয়। মানুষের ভিতর বিকটমূর্ত্তি দর্শন কোরে ভয় হয়। মানুষেরা সৎকার্য্যে যেমন প্রতিষ্ঠাভাজন হয়ে থাকে, দুষ্কার্য্যে রত দুরাচার মনুষ্য তদ্রূপ নিন্দাভাজন হয়।

কেবল এই পর্য্যন্ত ভেদ, এ কথাও বলা যায় না। সৎ-পুরুষ দর্শনে মনে যেমন প্রীতি ও সন্তোষের আবির্ভাব হয়, দুষ্টলোক দর্শনে স্বভাবতঃ মনে সেইরূপ ঘৃণার উদয় হয়ে থাকে। [...]

অমরকুমারী

বাড়ীখানা অনেকদিনের পুরাতন। দেয়ালে দেয়ালে নোনা ধোরেছে, ঠাঁই ঠাঁই চুণ-বালী খোসে পোড়েছে, ছাদের মাথায় ছোট ছোট গাছ বোসেছে, এক এক জায়গায় ফাট ধোরেছে। একতালা বাড়ী বটে, কিন্তু দুমহল। সদর-মহলে একখানি ঘর, সেই ঘরের সম্মুখে একটা রক, রকের ধারে ধারে গরান-কাষ্ঠের খুঁটী, খুঁটীদের মাথায় উলুখড়ের চাল। অন্দরমহলে সারি সারি তিনখানি ঘর, সেই ঘরগুলির সম্মুখেও ছোট ছোট থাম দেওয়া দর-দালান, মাথায় খড়ের চাল নয়, বরোগা দেওয়া ঢালু ছাদ। দর-দালানের ধারে রন্ধন-গৃহ। রক্তদন্ত আমাকে সঙ্গে কোরে ঐ তিনখানি ঘরের মাঝের ঘরে নিয়ে বসালে। সেই ঘরে একটী স্ত্রীলোক একখানি মাদুরের উপর শুয়ে ছিলেন, রক্তদন্ত তাঁকে সম্বোধন কোরে বোল্লে, "এই হরিদাস এসেছে, আদর-যত্ন কোরো, নজরে নজরে রেখো, কোথাও যেন পালায় না; ছেলেটা ভারী ছটফটে।"

স্বভাব কোথাও যায় না, কর্কশভাষীর কর্কশকণ্ঠ লুকায় না, প্রকৃতিসিদ্ধ কর্কশ আওয়াজে ঐ কথাগুলি বোলেই রক্তদন্ত সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। স্ত্রীলোকটী বিছানার উপর উঠে বোসলেন। কোমলদৃষ্টিতে অল্পক্ষণ আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোরে অতি

২৯৫ পৃষ্ঠার পর

(১৯০৩-০৪), *লণ্ডনরহস্য* (১৯১২—১৪), *নাগী ইউজিনীর বৈঠক* (১৯২৪)। তাঁর দেখাদেখি আরও অনেকেই গোয়েন্দা-কাহিনি চর্চায় এগিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে দীনেন্দ্রকুমার রায়কে এ ক্ষেত্রে ভুবনচন্দ্রের যোগ্য উত্তরসূরি বলা যায়। ভুবনচন্দ্রের আদর্শে দীনেন্দ্রকুমারও বিদেশি গোয়েন্দা-কাহিনি বাংলায় অনুবাদে হাত দেন এবং খ্যাতি ও অর্থ—দুই-ই অর্জন করেন। যা-ই হোক, অনুবাদে ভুবনচন্দ্রের ভালো হাত ছিল। বোধ করি ভুবনচন্দ্রই প্রথম বাংলায় স্যার জোনাথন সুইফটের বিখ্যাত *গালিভার্স ট্রাভলস*-এর অনুবাদ করেন *রজতকুমারী* (১৯০২) নাম দিয়ে। বইটি পরের বছর আবার চার খণ্ডে *আমার অপূর্ব্ব ভ্রমণ* নামেও প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত কয়েকখানা প্রহসনের নাম পাওয়া যায়: *মা এয়েচেন!!!* (১৮৭৩), *পাঁচ পাগলের ঘর* (১৮৮০), *ঠাকুরপো* (১৮৮৬)। রঙ্গব্যঙ্গ রচনাতেও তাঁর মতি ছিল, *মহাদেবের মাদুলী* তার দৃষ্টান্ত। ভুবনচন্দ্রের ভিন্ন ধরনের কিছু গদ্যরচনার সন্ধানও পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী লিখেছেন *রামকৃষ্ণ-চরিতামৃত* (১৯০১)। বৃহৎ কলেবরে 'সিপাহী-বিদ্রোহ বা মিউটিনি'র ইতিহাস লিখেছেন (১৯০৪)। তাঁর *স্বদেশবিলাস* সন্দর্ভ প্রকাশ পায় ১৮৯৩-এ। নামকরণ থেকে অনুমান করা যায়, বইটিতে স্বদেশ-অনুধ্যানের পাশাপাশি শখের স্বদেশোদ্ধারকারীদের সম্পর্কে হয়তো কিছু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গও থাকতে পারে। নকশা-রচনাতেও ভুবনচন্দ্রের আগ্রহের কমতি ছিল না। তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহের উদার আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। উড়নচণ্ডী ভুবনচন্দ্রকে কালীপ্রসন্ন কিছুকালের জন্য আশ্রয় ও জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। *হুতোম প্যাঁচার নকশার* প্রথম খণ্ড প্রকাশের মোটামুটি দুই বছর পর ভুবনচন্দ্র হুতোমের অনুসরণে *সমাজ কুচিত্র* (১৮৬৫) নামে একটি নকশা রচনা করে তা 'অনরেবল হুতোম'কেই উৎসর্গ করেন। জানা যায়, 'হুতোম'রূপী কালীপ্রসন্ন নিজেও *সমাজ কুচিত্রে* প্রশংসা করেছিলেন। আরও নকশা লিখেছিলেন ভুবনচন্দ্র, যেমন—*যাত্রা-বিলাস* (*বঙ্গের যাত্রার আসরের নক্সা*, ১৮৮৭), *ধর্ম্মরাজ* (১৯০১), *বঙ্গরহস্য* (১৯০৪) প্রভৃতি। এ ছাড়া তাঁর বইয়ের বিজ্ঞপ্তি থেকে মোটামুটি আরও প্রায় কুড়িটি বইয়ের সন্ধান মেলে।

এবার 'গুপ্তকথা'র প্রসঙ্গে আসি। বাজার-কাটতিতে 'গুপ্তকথা' নামের একটা বেশ আকর্ষণ ছিল। তাই 'গুপ্তকথা' নাম দিয়ে ভুবনচন্দ্র বেশ কয়েকটি বই লিখেছিলেন, যেমন—*এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা!! অতি আশ্চর্য্য!!!* (১৮৭০—৭৩), *রহস্য-মুকুর আশ্চর্য্য গুপ্তকথা!!* (১৮৭৭—৭৮), *বিলাতী গুপ্তকথা* (১৮৮৮—৮৯), *বঙ্কিমবাবুর গুপ্তকথা* (১৮৯০), *আর এক নূতন! হরিদাসের গুপ্তকথা!! অতি আশ্চর্য্য!!!* (১৯০৪), *রাজা আদিত্যনারায়ণের গুপ্তকথা*।

বাকি অংশ ২৯৭ পৃষ্ঠায়

কোমলস্বরে তিনি বোল্লেন, "হরিদাস! তোমারে আমি আর কখনো দেখি নাই, কর্ত্তার মুখে তোমার নাম শুনেছিলেম, তুমি এসেছ, বড় তুষ্ট হোলেম।" [...] স্ত্রীলোকটী [...] আবার বোল্লেন, "হরিদাস! তোমার মুখখানি এমন বিরস বিরস দেখছি কেন? পথে কি বড় কষ্ট পেয়েছ?"

রক্তদন্তের সাবধানতা স্মরণ কোরে ধীরে ধীরে মদুস্বরে আমি উত্তর কোল্লেম, "কষ্ট এমন কিছুই নয়, দুদিন আহার হয় নাই।" [...]

আমাকে সেই ঘরে বোসিয়ে সেই কৃপাময়ী রমণী অন্যঘরে উঠে গেলেন; বোলে গেলেন, "এইখানে একটু থাকো। আহা! দুদিন আহার হয় নাই, আমি তোমার আহারের আয়োজনে যাই।"

তিনি গেলেন, আমি একাকী বোসে বোসে আপন অদৃষ্টের ভাবনাই ভাবতে লাগলেম। ভাবছি, এমন সময় একটী বালিকা ধীরে ধীরে সেই ঘরে এসে আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন। বালিকাটীও দিব্য সুন্দরী। ফুট গৌরবর্ণ, কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকার, মুখখানি নিখুঁত সুন্দর, খগচঞ্চু নাসিকা, চক্ষু আকর্ণ বিশ্রান্ত, কপাল চৌরস, দাঁতগুলি ছোট ছোট, অধরোষ্ঠ লাল টুকটুকে, কেশ পরিপাটী, সর্ব্বাঙ্গই সুন্দর, কিন্তু কিছু কাহিল; বয়স অনুমান একাদশ কি দ্বাদশ বৎসর। ফল কথা, আমার অপেক্ষা কিছু কম বয়স দেহের উচ্চতায় উভয়েই আমরা সমান। মেয়েটীকে দেখে দেখে আমার তখন কেমন একপ্রকার নূতন আহ্লাদ হলো; আহ্লাদের সঙ্গে কিছু কিছু সংশয়। এ মেয়েটী কে? আর সেই রমণীই বা কে?

মনের সংশয় মনে চেপে রেখে মেয়েটীকে আমি বোসতে বোল্লেম। মেয়েটী বোসলেন না, যে ভাবে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন। ইতোমধ্যে পূর্ব্বোক্ত রমণী পুনর্ব্বার সেই ঘরে এসে পূর্ব্ববৎ কোমলস্বরে আমারে বোল্লেন, "হরিদাস!

প্রমোদাসুন্দরী. রঙিন লিথোগ্রাফ

২৯৬ পৃষ্ঠার পর

ভুবনচন্দ্রের কৃতি সম্পর্কে আজকের বাঙালি পাঠকের প্রায় কিছুই জানা নেই। *হুতোম প্যাঁচার নকশার* প্রকৃত লেখক কে—এমন বিতর্ক একসময় উঠেছিল, তখন কেউ কেউ রায় দিয়েছিলেন ভুবনচন্দ্রের পক্ষে। সুকুমার সেন নানা কারণে সন্দেহ করেছেন, *হুতোম প্যাঁচার নকশার* রচয়িতা ভুবনচন্দ্রই। অবশ্য তাঁর এই মত সমর্থিত হয়নি। আবার প্রায়-অকালমৃত মধুসূদনের *মায়াকানন* নাটকের অসম্পূর্ণ শেষ অঙ্কটি লেখার দায় ভুবনচন্দ্রের ওপরেই বর্তেছিল। প্রিয় পাঠক, আরও মনে করিয়ে দিই, এই ভুবনচন্দ্রই মীর মশাররফ হোসেনের *বসন্তকুমারী নাটক* ও *বিষাদ-সিন্ধুর* পাণ্ডুলিপি 'উত্তমরূপে সংশোধন করিয়া বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় সুসজ্জিত করেন' (*সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা* ৮ম খণ্ড)। ভুবনচন্দ্রের বইয়ের বিজ্ঞাপন (১৮৮৭) থেকে জানা যায়, তিনি *মহরম* নামে একটি বই লিখেছিলেন, মূল্য ছিল এক টাকা। অনুমান করতে বাধা নেই যে, হয়তো *বিষাদ-সিন্ধুর* প্রেরণাতেই তিনি এই বইটি লিখেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে ভুবনচন্দ্রের অবদান প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে: 'উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে কয়জন ভগীরথ [অনুবাদ-অনুসরণের] প্রবাহ বঙ্গদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন, ভুবনচন্দ্র তাঁহাদের অগ্রণী ও প্রধান। তাঁহার অক্লান্ত লেখনী বাঙালীকে অনেক বৈদেশিক গল্প একান্ত দেশী রূপ দিয়া শুনাইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির প্রকাশ্য সাহিত্য-সাধনার আমরা খবর রাখি; কিন্তু গুপ্তকথা ও রহস্য-গল্পের বিপুল গোপন ধারা আমাদের অগোচরে রহিয়া গিয়াছে। যাহা এককালে আমাদের অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজকে ও অন্তঃপুরকে মাতাইয়াছিল, কালের প্রচণ্ড আঘাতে তাহা আজ বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু এগুলির সাহায্যে আমাদের মাতৃভাষা যে পুষ্ট হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিলে আমাদের প্রত্যবায় হইবে। তাই কৃতজ্ঞচিত্তে আমরা মধুসূদন-কালীপ্রসন্ন সিংহের উত্তর-সাধক রহস্যোপন্যাসের রাজা ভুবনচন্দ্রকে স্মরণ করিলাম' (*সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা*, ৮ম খণ্ড)।

হরিদাসের গুপ্তকথা ভুবনচন্দ্রের সাড়া-জাগানো উপাখ্যান। তাঁর *ঠাকুরবাড়ীর দপ্তর*-এর (১ম খণ্ড, ১৯০০) ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছিলেন: 'ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে *হরিদাসের গুপ্তকথার* জন্ম। সেই রহস্যোপন্যাসখানি আমার লেখনী-লতিকার প্রথম ফুল—প্রথম ফল।' কিন্তু তাঁর পুস্তক-প্রকাশের বিবরণে দেখা যায়, এর পাঁচ বছর আগে (১৮৬৫) প্রকাশিত *সমাজ কুচিত্রই* তাঁর প্রথম বই। এ থেকে ধারণা করা যায়, *হরিদাসের গুপ্তকথা* আগে লেখা হলেও হয়তো কোনো কারণে পরে প্রকাশ পায়। আর সেই প্রথম প্রকাশকালে *এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা!! অতি আশ্চর্য্য!!!* নামের বইটি প্রকাশিত হয়—কাহিনি অবশ্য হরিদাসেরই। *হরিদাসের গুপ্তকথা* নামের বই বের হয় আরও

বাকি অংশ ২৯৮ পৃষ্ঠায়

এটা তোমার ভগিনী হয়, এটী আমারি কন্যা, এর নাম অমরকুমারী। তোমরা দুটী ভাই-ভগিনীতে এইখানে বোসে গল্প কর, একটু পরেই আবার আমি আসছি।"

আমাকে ঐ কথা বোলে কন্যাটীকে সম্বোধন কোরে তিনি বোল্লেন, "অমর! এই সেই হরিদাস; কর্ত্তার মুখে যার কথা শুনেছিলে, এই সেই হরিদাস। তোমার পিসীমার ছেলে, হরিদাসের কাছে লজ্জা কোত্তে নাই; ভাই হয়, ভাইকে দেখে কেহ কি লজ্জা করে—বোসো; বোসে দুজনে কথাবার্ত্তা কও, লেখাপড়ার পরিচয় দাও, লজ্জা কি? আমি শুনেছি হরিদাস বেশ লেখাপড়া জানে, হরিদাসের কাছে তোমার অনেক শিক্ষা হবে; দুটীতে বেশ আমোদে থাকবে; বোসো।" [...]

মনে অনেক প্রকার তোলপাড় কোল্লেম, ক্রমশই সংশয় বিস্ময় বেড়ে উঠতে লাগলো। কথাটা চাপা দিয়ে অমরকুমারীকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কোথায় আমি এসেছি? এটা কোন স্থান? এ গ্রামের নাম কি?"

অমরকুমারী বোল্লেন, "গ্রামের নাম নন্দীগ্রাম, বীরভূম জেলা, অতি নিকটেই সিউড়ি সহর। এ জেলার নাম তুমি কি কখনো শুন নাই?" [...]

[...] তখন আমি মনে মনে আর একটা কথা ভাবছিলেম; কেমন একটা কৌতূহলের উদয় হয়েছিল, খানিকক্ষণ চুপ কোরে থেকে, সমসূত্রে কুমারীর মুখপানে চেয়ে, মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "অমর! তোমার বিবাহ হয়েছে?"

মেঘের কোলে চপলা একবারমাত্র খেলা কোরেই অমনি মেঘ-সাগরে ডুবে গেল। নম্রমুখখানি অবনত কোরে দীর্ঘ দীর্ঘ নেত্রপল্লবে পদ্মমুখী তখনি তখনি দুটী পদ্মনেত্র ঢাকা দিয়ে ফেল্লেন; সুন্দর কপোলযুগল আরক্তবর্ণ ধারণ কোল্লে; একটু পূর্ব্বে যে মুখে কত কথাই শ্রবণ কোচ্ছিলেম, সে মুখে আর তখন একটী বাক্যও নিঃসৃত হলো না; লজ্জাবনতমুখী বালিকা ধীরে ধীরে উঠে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। [...]

নানা কথা ভাবছি, রাত্রিও ক্রমশঃ বাড়ছে, ঘর থেকে বেরিয়ে একবার বারান্দায় এলেম, জ্যোৎস্না-রজনী; ফুট জ্যোৎস্না। আকাশে শুক্লপক্ষের দ্বাদশকলা চন্দ্রমার সমুদ্রহাস্য; পৃথিবীও হাস্যমুখী। এ শোভা দেখলে স্বভাবতই মানুষের মনে আনন্দ জন্মে, আমার মনে আনন্দ এলো না; প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনে, কি যেন এক প্রকার আতঙ্কে আমি কেঁপে উঠলেম। কি অমঙ্গল?—বারান্দায় আর দাঁড়ালেম না, আবার সেই নির্জ্জন ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। কি জানি, কিরূপে ঘরের প্রদীপটী তখন নিবে গিয়েছিল; অন্ধকারে আমি বোসে থাকলেম। সহচর আতঙ্ক, সহচরী চিন্তা। অমরকুমারী এলেন না।

রাজধানী

গঙ্গার পূর্ব্বতীরে কলিকাতা সহর। এই সহরটী এখন ভারতবর্ষের রাজধানী। ইংরেজরা এখানে মা গঙ্গার নাম রেখেছেন হুগলী। [...] গঙ্গাকে তাঁরা ইচ্ছামত ভিন্ন ভিন্ন নামে ভাগ কোরে নিয়েছেন। কোথাও গঙ্গা, কোথাও ভাগীরথী, কোথাও হুগলী; যে স্থানটুকু গঙ্গা, সে স্থানেও তাঁরা গঙ্গা-নামটী লেখেন না, কল্পনাবলে ভূগোলাদিতে লিখে দেন, 'গ্যাঞ্জেস্।" [...]

মা গঙ্গার পূর্ব্বতীরে কলিকাতা। নৌকাপথে আমাদের কলিকাতায় আসা হয়েছিল। যে ঘাটে আমরা অবরোহণ করি, সেই ঘাটটীর নাম জগন্নাথ-ঘাট। সে ঘাটে নৌকা লাগাবার কারণ এই ছিল যে, জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বীরভূমের বাণেশ্বরবাবুদের একখানি বাড়ী ছিল, সেই বাড়ীখানি জগন্নাথ-ঘাট থেকে অতি নিকট। নৌকা থেকে উঠে প্রথমেই আমরা জোড়াসাঁকোতে গেলেম। যতদূর গেলেম, ততদূর কেবল দু-ধারে সারি সারি ছোটবড় অট্টালিকা; মাঝে মাঝে দোকান। বাবুদের বাড়ীতে রাত্রিবাস করা হলো [...]

প্রভাতে নগরদর্শন। নরহরিবাবুর মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসা আছে, কলিকাতার অন্ধি-সন্ধি তাঁর বেশ জানা ছিল, তিনি আমাকে সঙ্গে কোরে সহরটী দেখালেন। শকটারোহণে নগরদর্শন ভাল হয় না, অতএব প্রাতে ও অপরাহ্ণে পদব্রজেই আমরা বেরুতেম। পূর্ব্বে কখনো আমি কলিকাতা দেখি নাই, এই সবে নূতন দেখা; দুএক দিনে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে দর্শন করা অসম্ভব, ভ্রমণে ও দর্শনে আমাদের সাত দিন লাগলো। যা যা দেখলেম, সমস্তই আশ্চর্য্য।

বাড়ী, গাড়ী, দোকান, এই তিনটী জিনিস অসংখ্য। যে দিকে যাই, সেই দিকেই বাড়ী, সেই দিকেই গাড়ী, সেই দিকেই দোকান। ঠাঁই ঠাঁই বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা; ক্ষুদ্র-বৃহৎ এত বাড়ী আমি দর্শন কোল্লেম, গণনা কোরে শেষ করা যায় না। এক জায়গায় এত অট্টালিকার সমাবেশ, সেই কারণেই বোধ হয়, কলিকাতার নাম প্রাসাদ-নগরী। কলিকাতায় বাজার অনেক, বাজারগুলি তন্ন তন্ন কোরে আমি দেখলেম; বাজারে বাজারে নানাদেশের নানাপ্রকার জিনিসপত্র বিক্রয় হয়। ইংরেজী-বাজার ধর্ম্মতলায়, বাঙালীবাজার বাঙালীটোলায়। বাজারগুলি দিব্য গুলজার। নিকটে নিকটে পুলিশের থানা, রাস্তায় রাস্তায় দিবারাত্রি প্রহরীদের ঘাঁটি। নরহরিবাবুর সঙ্গে থানাগুলি আমি দেখলেম, আদালতগুলি আমি দেখলেম, কেল্লা আর কেল্লার মাঠ একদিন দেখে এলেম। দক্ষিণে আলীপুর, ভবানীপুর, কালীঘাট। আলীপুরে নরহরিবাবুর মোকদ্দমা। একদিন তাঁর সঙ্গে আলীপুরে গিয়ে সেখানকার আদালতগুলিও দর্শন কোল্লেম। দেওয়ানী, ফৌজদারী এক জায়গায় নয়, ফৌজদারী কাছারীর অনেক দূরে পশ্চিমে স্বতন্ত্র বাড়ীতে জজ-আদালত;

২৯৭ পৃষ্ঠার পর

অনেক পরে, ১৯০৪ সালে। এখানেও গ্রন্থনামের আগে উল্লেখ করা হয়েছিল, 'আর এক নতুন!' আর শেষে 'অতি আশ্চর্য্য!!!'—এই কথাটি। তবে *আমার গুপ্তকথার* গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূত্রে জানা যায়: ৮৭০ পৃষ্ঠার এই বইটি রচিত হয় 'রেনল্ডসের Joseph Wilmot-এর ছায়াবলম্বনে। *হরিদাসের গুপ্তকথার*...গোড়ার পর্ব্ব ও আদিরূপ। ১৮৭০ সনের ডিসেম্বরে সংখ্যানুক্রমে ৮ পৃষ্ঠা করিয়া প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮৭৩ সনের বসন্তকালে সমাপ্ত হয়' (*সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা*, ৮ম খণ্ড)। ৩৪ বছর পরে (ফাল্গুন ১৩১০/১৯০৪) এই বইটিই *আর এক নূতন! হরিদাসের গুপ্তকথা!! অতি আশ্চর্য্য!!!* নামে 'নবন্যাস' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে প্রকাশিত হয়, তখন অবশ্য গ্রন্থের কলেবর নেমে আসে ৬৪৪ পৃষ্ঠায়—তার কারণ হয়তো এটি *গুপ্তকথার* দ্বিতীয় পর্ব বলে। চার খণ্ডে সম্পন্ন এই বই সম্পর্কে বলা হয়: 'নূতন লিখিত—আধুনিক বঙ্গের সমাজচিত্র'। লেখক তাঁর ভূমিকায় উল্লেখ করেন, 'ইহার আদ্যোপান্ত নূতন অলঙ্কারে সজ্জিত; সমস্তই নূতন, সর্ব্বাংশেই নূতন, সম্পূর্ণরূপেই নূতন।'

হরিদাসের গুপ্তকথার প্রকৃত লেখক কে, তা নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায়* ভুবনচন্দ্রের বইয়ের তালিকায় হরিদাস-কাহিনির দুই পর্বের লেখক হিসেবেই ভুবনচন্দ্রের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রচয়িতা হিসেবে কলকাতার শোভাবাজারের রাজকুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের নামও এসে যায়। এই বইয়ের প্রথম প্রকাশের ভূমিকায় প্রকাশক শোভাবাজারের নবীনকৃষ্ণ বসু বলেছিলেন, 'কলিকাতা শোভাবাজারের রাজকুল-কিশোর স্বজাতীয় কাব্যসাহিত্যের অকপট অকৃত্রিম মিত্র, শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এতৎ উপাখ্যানের স্থূল গ্রন্থি, স্থূল মর্ম্ম, স্থূল বৃত্তান্ত এবং স্থূল স্থূল সমস্ত আখ্যানকাণ্ড আখ্যান করেন। তাঁহার উপদেশে, তাঁহার সাহায্যে এবং তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে, তাঁহার অকৃত্রিম পরম মিত্র *সংবাদ প্রভাকর* পত্রের সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপযুক্ত অলঙ্কারাদি যোগে উক্ত রাজকুমার বাহাদুরের নামে (আর এই আখ্যানের অঙ্গীভূত যা কিছু থাকা সম্ভব, উক্ত রাজকুমার বাহাদুরের সহায়ে, উৎসাহে, অধ্যবসায়ে, উত্তেজনায় আর মনোনিবেশে) এই আখ্যানটি রচনা করেন।' উকিলি ভাষায় প্রকাশক মহোদয় তাঁর বক্তব্য পেশ করলেও এর লেখক যে ভুবনচন্দ্র, তা অস্বীকার করতে পারেননি। সাহিত্যানুরাগী উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন, এমন খবর জানা না গেলেও তাঁর নামে একটি উপন্যাস *রত্নগিরি—আশা প্রতীক্ষা* তিন খণ্ড, ১২৮৮—৯০) প্রকাশিত হয়েছিল। আর সেকালে রাজা-রাজড়া, জমিদার-বিত্তবানেরা অর্থের বিনিময়ে পেশাদার

বাকি অংশ ২৯৯ পৃষ্ঠায়

সেই বাড়ীতে জজ, সদর-আলা, সদর-আমীন আর মুন্সেফেরা এজলাস করেন। দেওয়ানী-ফৌজদারী বড় আদালত আর এতাধিক হাকিম বঙ্গদেশের আর কোন জেলাতেই নাই। এই জেলাটী সদরজেলা; এ জেলার নাম চব্বিশ পরগণা। রাজধানীর নিকট বোলেই এই জেলার প্রাধান্য। বঙ্গদেশের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর এই আলীপুরের বেলভেডিয়ার উদ্যানে বাস করেন।

কলিকাতা উত্তম সহর; লোকের মুখে শুনলেম, পূর্ব্বে কলিকাতার এ অবস্থা ছিল না। স্থানে স্থানে জঙ্গল ছিল, বাগান ছিল, পচা পচা পুষ্করণী ছিল, পশু-পক্ষী অনেক বাস কোত্তো, ভদ্রলোক অপেক্ষা ইতরলোক আর দুষ্টলোকই বেশী ছিল, ক্রমে ক্রমে সংস্কার হয়ে আসছে।

এ সকল কথার সার্থকতাও আমি বেশ অনুভব কোল্লেম। অনেকগুলি রাস্তার নামে তদ্বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। হাতীবাগান, বাদুড়বাগান, ভাল্লুকবাগান, ডালিমবাগান, পেয়ারাবাগান, গুয়াবাগান, হরীতকীবাগান, চোরবাগান, জোড়াবাগান, ডিঙ্গীভাঙা, শানকীভাঙা, কসাইটোলাঁ, উলটাডিঙী, নারিকেলবাগান ইত্যাদি পরিচয়ে বেশ জানা যায়, পূর্ব্বে এ সহরের এরূপ শ্রী ছিল না; পুষ্করণী-পরিচয়ে এক দৃষ্টান্ত হেদুয়াদিঘী। ইংরেজ-শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের অনুগ্রহে কলিকাতা ক্রমে ক্রমে সুন্দর শ্রীধারণ কোচ্ছে, ক্রমশঃ আরও সুন্দর হবে, তারও আভাস পাওয়া গেল। [...]

একদিন একটী ভদ্রলোক আমাকে সাবধান কোরে বোল্লেন, "এ সহর বড় ভয়ঙ্কর স্থান, চোর, জুয়াচোর, গাঁটাকাটা, জুয়ারী, মাতাল, লম্পট এখানে অনেক; ভদ্রলোকের সঙ্গে তুলনায় বদমাসলোকের সংখ্যাই অধিক। সহরে যখন একাকী বাহির হবে, খুব সতর্ক হয়ে থেকো, অচেনা লোকের কথায় শীঘ্র বিশ্বাস কোরো না, দুষ্টলোকের মিষ্টকথায় ভুলো না,

দুই নটিনী, কালিঘাটের পট, উনিশ শতক

২৯৮ পৃষ্ঠার পর

লেখকদের দিয়ে পারিবারিক ইতিহাস, পূর্বপুরুষ বা নিজের জীবনী লিখিয়ে প্রকাশও করতেন। টাকা দিয়ে বই লিখিয়ে নিজের নামে প্রকাশের দৃষ্টান্তও একেবারে কম নয়। পরান্নে পরাশ্রয়ে পালিত অভাবী ভুবনচন্দ্রও সেই রকম ভূমিকাই হয়তো পালন করেছিলেন। নইলে ইংরেজি-জানা ভুবনচন্দ্র রেনল্ডসের বই পড়ে নিজে বুঝতে না পেরে উপেন্দ্রকৃষ্ণের সহায়তা নেবেন, তা বিশ্বাস করা কঠিন। পরে ১৯০৬ সালে *এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা!! অতি আশ্চর্য্য!!!* বইটি সরাসরি উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের নামেই প্রকাশিত হয়। অবশ্য এর দুই বছর আগে ভুবনচন্দ্রের *আর এক নূতন! হরিদাসের গুপ্তকথা!! অতি আশ্চর্য্য!!!* বইটি সম্পূর্ণ নতুন কলেবরে প্রকাশ লাভ করে। *এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা!!* বইয়ের প্রথম প্রকাশের ভূমিকায় প্রকাশক বলেছিলেন, ভুবনচন্দ্র উপেন্দ্রকৃষ্ণের 'নামে' 'এই আখ্যানটি রচনা করেন'। কিন্তু দ্বাদশ সংস্করণে (১৯০৬) প্রকাশক মহোদয় উল্লেখ করেছেন, '...শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুর এতৎ উপন্যাসের একমাত্র প্রণেতা,—তিনিই এই রহোন্যাসটি বিরচন করেন...।' প্রকাশকের একই প্রসঙ্গে দুই ধরনের উক্তি বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। এ নিয়ে ভুবনচন্দ্র ও উপেন্দ্রকৃষ্ণের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়। কীভাবে এই বিবাদের নিরসন হয়, তা জানা যায় না। তবে পরেও ভুবনচন্দ্রই যে *হরিদাসের গুপ্তকথার* লেখক, তা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'দুইজনে মিলেই এই "রহোন্যাস"-টি লিখেছিলেন, একা ভুবনচন্দ্র লেখেন নি' (*বাঙালির ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি*, কলকাতা, ২০০২)—রমাকান্ত চক্রবর্তীর এই ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা তা ভুবনচন্দ্র বা উপেন্দ্রকৃষ্ণ কারও বক্তব্যেই সমর্থিত হয়নি। ভুবনচন্দ্র তাঁর *ঠাকুরবাড়ীর দপ্তর* (১ম খণ্ড, ১৯০০) বইয়ের ভূমিকায় স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন, 'ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে *হরিদাসের গুপ্তকথার* জন্ম। সেই রহস্যোপন্যাসখানি আমার লেখনী-লতিকার প্রথম ফুল—প্রথম ফল।'

এই লেখক-বিতর্ক নিয়ে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার ভেতর দিয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছেন (*সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা*, ১০৯ বর্ষ ১-২ সংখ্যা : ১৪০৯)। রামকৃষ্ণ যুক্তি-তর্ক দিয়ে বলতে ও বোঝাতে চেয়েছেন, উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবই *এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা!! অতি আশ্চর্য্য!!!* বইটির লেখক। উপেন্দ্রকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি ভুবনচন্দ্রকে খাটো করেছেন এবং কিছু অবাঞ্ছিত মন্তব্য করতেও ছাড়েননি। এমনকি ভুবনচন্দ্রের সাহিত্যকৃতি কিংবা খ্যাতিকেও খারিজ করতে চেয়েছেন। উপেন্দ্রকৃষ্ণের প্রতি তাঁর পক্ষপাত এবং ভুবনচন্দ্র সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের মনোভাব প্রচ্ছন্ন থাকেনি। তবে 'হরিদাস'-এর জনক হিসেবে সুকুমার সেন কিংবা শ্রীপান্থর (*বটতলা*, কলকাতা, ১৯৯৭)

বাকি অংশ ৩০০ পৃষ্ঠায়

ছেলেমানুষ তুমি, খুব সাবধান হয়ে চলো; অসাবধান হোলেই বিপাকে ঠেকবে। সাবধান! সাবধান! বিশেষতঃ রাত্রিকালে।" [...]

নরহরিবাবুর দেশে যাবার দিন নিকট হয়ে এলো। আমাকে তিনি কোথায় কার কাছে রেখে যাবেন, বোধ হয়, আগে থেকেই ভেবেছিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর পাড়ার একটী ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তে আসেন, লোকটীর বয়স কিছু ভারী, দিব্য শান্তমূর্ত্তি, চেহারায় জানা যায়, বাবুলোক। আমাকে কাছে ডেকে, নরহরি সেই লোকের নিকটে সুপারিশ কোরে সংক্ষেপে সংক্ষেপে বোল্লেন, "এই ছোকরার কথাই আমি আপনাকে বোলেছিলেম; যেমন বয়স, সেই হিসাবে সম্ভবমত লেখাপড়া শিখেছে, চরিত্র খুব ভাল, অবাধ্যতা জানে না, অত্যন্ত গরিব, আপনি যদি দয়া কোরে এটীকে রাখেন, আমার যথেষ্ট উপকার করা হবে, গরিবকে আশ্রয় দিলে আপনারও পুণ্য হবে, ইহার দ্বারা আপনার ছোট ছোট কাজকর্ম্ম বেশ চোলবে, ছোকরা খুব বিশ্বাসী, সত্যবাদী, ধর্ম্মভীরু; অল্পদিনে অনেক পরিচয় আমি পেয়েছি।"

তাঁকে আর বেশী কথা বোলতে হলো না, আমার মুখপানে চেয়ে, একটু হেসে ভদ্রলোকটী বোল্লেন, "কি বল হরিদাস! আমার বাড়ীতে তুমি থাকবে? কাজকর্ম্ম বেশী কিছু নয়, দপ্তরখানায় বোসে অল্প অল্প লেখাপড়া করা; আর বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হোলে এক আধবার বাজারে যাওয়া, এই মাত্র কার্য্য। কেমন, রাজী আছ?"

নমস্কর কোরে তৎক্ষণাৎ আমি সম্মত হোলেম। [...]

এ আবার কি কাণ্ড?

[...] বঙ্গের প্রধান পর্ব্ব দুর্গাপূজা। বৎসরের মধ্যে হিন্দুজাতির এমন পর্ব্ব আর নাই। বৎসরের মত দূর্গাপূজা ফুরিয়ে গেল। আশ্বিন মাস প্রায় শেষ। ছয় মাস আমি কলিকাতায়। রাস্তাঘাট অনেক জানা হয়েছিল, বিসর্জ্জনের পাঁচদিন পরে, জাগোর-পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যে আমি একাকী চিৎপুর রোডে বেড়াতে বেরিয়েছিলেম। বৈকালে এ রাস্তায় আমি একদিনও আসি নাই। অন্যদিন অন্য সময়ে এ রাস্তায় যে রকম ভিড় আর যে রকম শোভা দেখি, আজো সব সেই রকম, কেবল একটা শোভা আজ আমার চক্ষে নূতন। গরাণহাটা থেকে কলুটোলা-রাস্তা পর্য্যন্ত বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখলেম, দুধারি বারান্দায় বারান্দায় রকমারি মেয়েমানুষ। রকমারি বর্ণের কাপড়পরা, রকমারি ধাতুর গহনাপরা, রকমারি ধরনের খোঁপাবাঁধা, অনেক রকম মেয়েমানুষ। কেহ কেহ টুলের উপর বোসে আছে, কেহ কেহ চেয়ারে বোসেছে, কেহ কেহ রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে রূপা-বাঁধা হুকায় তামাক খাচ্ছে, কেহ কেহ রেলিঙের উপর বুক রেখে ভানুমতী-ধরনের মুখ বাড়িয়ে রাস্তার দিকে ঝুলছে; কারো বুকে রঙদার কাঁচুলী, কারো কারো মুখে রংমাখা, কারো খোঁপা নাই, পৃষ্ঠদেশে দীর্ঘবেণী, কেহ কেহ এলোকেশী। কারা এরা? লোকমুখে শুনেছিলেম, কলিকাতা সহরে বেশ্যা অনেক; যে সকল পণ্ডিত সাধুভাষায় কথা কন, তাঁরা বলেন, বেশ্যা মানে নগরবিলাসিনী বারাঙ্গনা; সুখবিলাসী মতিচ্ছন্ন যুবাদলের চিত্তমোহিনী-বিলাসিনী; এরা সব জঘন্য বিলাস-রসিক যুবাপুরুষের ইহকাল পরকাল ভক্ষণ করে। চিৎপুর রোডে দাঁড়িয়ে পূর্ব্বের সেই শোনা-কথাটা আমার মনে পোড়লো, স্থির কোল্লেম, এরাই তবে সেই সকল যুবক-নাশিনী বিলাসিনী বারাঙ্গনা। দেখেই আমি চোমকে উঠলেম। সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিলে। নগরের বিলাসিনীর স্ত্রী-জাতিসুলভ লজ্জাসম্ভ্রমের মস্তকে পদার্পণ কোরে, হেসে হেসে সদররাস্তার ধারে বাহার দিচ্ছে! আকার-অবয়বে ঠিক মানবী, কিন্তু ব্যবহারে এরা দানবী—পিশাচী! কলিকাতা সহর কলুষে পরিপূর্ণ। সিঁতিকাটা, গন্ধমাখা, সাজপরা ফুলবাবুরা রাস্তা দিয়ে চোলে যাচ্ছেন, চক্ষু আছে ঊর্দ্ধ দিকে! বারান্দার চক্ষুরা তাঁদের দিকে ঘুরে ঘুরে ঘন ঘন কটাক্ষবাণ সন্ধান কোচ্ছে। সহরের একজন পক্ষীকবি এই সব কাণ্ড লক্ষ্য কোরে এক মজলীসে বোলেছিলেন, "বারান্দার ঐ চক্ষুগুলি পাখীধরা ফাঁদ; পুরুষের মন মাতাবার মোহনমন্ত্রের বাঁশী!" আমারো মনে হলো, যথার্থই তাই।

চিৎপুর রোড এই সকল ফাঁদে আচ্ছন্ন। এ রাস্তাটায় গৃহস্থলোকের বাস একেবারে নাই বোল্লেই হয়। থাকলেই বা কি হতো? কলিকাতার বেশ্যা-নিবাসের প্রণালীটা অতি জঘন্য। গৃহস্থের বাড়ীর কাছে বেশ্যা, ছেলেদের পাঠশালার পাশে বেশ্যা, ডাক্তার-কবিরাজের আবাসের পাশে বেশ্যা, কোথাও বা ভালমানুষের মাথার উপর বেশ্যা; অধিক কথা কি, ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরের আষ্টে-পৃষ্ঠে বেশ্যা। যে সহরের এমন দশা, সে সহরের পরিণাম কি হবে, সহরবাসী ভদ্রলোকেরা সেটা কি একবারও চিন্তা করেন না? ইংরেজীতে যাঁরা যাঁরা পণ্ডিত হয়েছেন, সগৌরবে তাঁরা মুক্তকণ্ঠে বলেন, "যেখানে সহর, সেইখানেই পাপ। সহরমাত্রেই বেশ্যা বেশী, মদ বেশী, বদমাস বেশী, রাজধানীতে আরো বেশী। রাজধানীতেই পাপের রাজত্ব। এ সকল পাপের নাম উপকারী পাপ; প্রয়োজনীয় পাপ। এ সকল পাপ না থাকলে কোন দেশেই সহর চলে না।"

২৯৯ পৃষ্ঠার পর

স্বীকৃতি ভুবনচন্দ্রই লাভ করেছেন। এই বিষয়ে স্বতন্ত্র পরিসরে আলোচনার ইচ্ছে রইল। তবে এ কথা ঠিক যে, উত্তরকালের পাঠক এ দুজনের কাউকেই মনে রাখেননি, তবে সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় উপেন্দ্রকৃষ্ণ নন, ভুবনচন্দ্রই স্থান পেয়েছেন। শুধু স্মরণ করতে বলি, ভুবনচন্দ্রের মৃত্যুর পর সাহিত্যিক-সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেগময় ভাষার কথাগুলো : 'একটা কথা সাহিত্য-পরিষদ্, সাহিত্যসভা প্রভৃতি মোড়লদের জিজ্ঞাসা করিব, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মরিয়াছেন, তোমাদের সে খবর আছে কি? আলালের সময় হইতে যিনি বাঙ্গালার গদ্যপদ্য লেখক, মাইকেলের সহচর, যাঁহার লিখিত পুস্তকরাশির সংখ্যা করা যায় না, যাঁহার পাঠকগণেরও সংখ্যা হয় না—সেই সরল, সোজা, দেশী বাঙ্গালা গদ্যের লেখক ভুবনচন্দ্রের মতন অনুবাদক বাঙ্গালায় আর ছিল না—বোধ হয় আর হইবে না। আর...তুমি ভুবনচন্দ্রের মনীষা বেচিয়া এত অর্থ পাইয়াছ, তুমি সেই বুড়ার মরণে কি করিলে? কি করিবে? নাটুকে রামনারায়ণের সময় হইতে যে ভুবনচন্দ্রের প্রতিভা একটানা গঙ্গাস্রোতের মত সমানভাবে ষাট বৎসরকাল বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে বহিয়া গিয়াছে, সেই ভুবনবাবু দলের একজন ছিল না বলিয়া আজ বিস্মৃতিসাগরে ডুবিল' (*নায়ক*, ২৩ ভাদ্র ১৩২৩)।

হরিদাসের গুপ্তকথা চার খণ্ডে বিভক্ত। অধ্যায় এখানে 'কল্প' নামে নির্দেশিত। প্রথম খণ্ডে উনিশ, দ্বিতীয় খণ্ডে নয়, তৃতীয় খণ্ডে বারো এবং চতুর্থ খণ্ডে একটি 'কল্প' বা অধ্যায় ও সেই সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে একটি 'উপসংহার'। *হরিদাসের গুপ্তকথা, লণ্ডন-বটতলার* জনপ্রিয় লেখক জর্জ উইলিয়ম ম্যাকআর্থার রেনল্ডসের *জোসেফ উইলমট*-এর 'ছায়াবলম্বনে' রচিত বলা হয়। রেনল্ডস আমাদের বটতলার লেখক ও একধরনের পাঠকের কাছে বেশ প্রিয় ছিলেন। রেনল্ডসের বইয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় না থাকায় তাই তুলনা করার সুযোগ নেই। সে কারণে বলা মুশকিল, অনুবাদ বা ঋণ-গ্রহণের পরিমাণ ও ধরনটা কেমন ছিল। তবে *হরিদাসের গুপ্তকথা* পড়লে কাহিনি-উৎস জানা না থাকলে এটি যে কোনো বিদেশি বইয়ের অনুবাদ বা ভাবানুবাদ বা ছায়ানুবাদ—এ কথা আদৌ মনে হয় না। হয়তো কাহিনির কাঠামোগত কোনো ধারণা লেখক এই ইংরেজি রহস্য-কাহিনির বই থেকে নিয়েছিলেন। সামান্য ব্যতিক্রম বাদে এই কাহিনির স্থান-কাল-পাত্র যে নিরঙ্কুশ বঙ্গদেশীয়, তাতে কোনোই সংশয় নেই। এখানে ইংরেজ লেখকের বইয়ের উল্লেখ হয়তো পাঠকের আগ্রহ উসকে দেওয়ার কৌশলমাত্র—পাঠককে আকৃষ্ট করার সূক্ষ্ম ফন্দি। তবে 'গুপ্তকথা'র গুণের দিক বিচার করলে দেখা যাবে, সমাজের ছবি কাহিনি-পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে এসেছে আর আগাগোড়া চলতি গদ্যে ঠাসবুনুনি কাহিনি পাঠককে ধরে রাখে—তাঁর কৌতূহলকে বিশ্রাম দেয় না।

কেউ কেউ 'হরিদাস' নামটি যে বাঙালিসমাজে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উচ্চারিত হয়, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সেই দিক

বাকি অংশ ৩০১ পৃষ্ঠায়

না চলাই ভাল। সর্ব্বনাশকর পাপের অভাবে সহর যদি না চলে, তবে সহরে আমাদের কাজ কি? সহরের উপর আমার ঘৃণা হলো। কলিকাতায় আর বেশী দিন থাকবো না, মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা কোল্লেম। পথিক পুরুষেরা রাস্তা দিয়ে চোলে যায়, বারান্দার দিকে চক্ষু থাকে, উপরে নীচে রসিকতা বর্ষে, গাড়ী-ঘোড়ার ধাক্কায় আছাড় খেয়ে হাত-পা ভাঙতে পারে, তেমন তেমন হোলে, প্রাণ যেতেও পারে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপও থাকে না। এমন সহরে কি থাকতে আছে? কখনই থাকবো না। মনের ঘৃণায় এইরূপ সঙ্কল্প কোরে বাড়ীর দিকে আমি ফিরে চোল্লেম।

বীরভূমের নরহরিবাবু যে বাড়ীতে ছিলেন, সেই বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে আমার মনিববাড়ী যেতে হয়। সেই পথ দিয়ে আমি যাচ্ছি, দেখলেম সেই বাড়ীর দরজা খোলা। মনে কোল্লেম, নরহরিবাবু এসেছেন। সূর্য্য তখনও অস্ত যান নাই, অল্প অল্প বেলা ছিল, আশায় আশায় সেই বাড়ীর ভিতর আমি প্রবেশ কোল্লেম; উপরে গিয়ে উঠলেম; দুই-একজন চাকর আমার সম্মুখ দিয়ে চোলে গেল, আমাকে দেখে কিছুই বোল্লে না, আমিও কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লেম না; সরাসরি একটা ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। ঘরে একখানি চেয়ারের উপর একটী বাবু। বেশ বাবুটী। দিব্য সুপুরুষ। বাবরী চুল, দিব্য গোঁফ, দিব্য চক্ষু, দিব্য বুকের ছাতি, বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর। আমারে দেখেই বাবু চকিতস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তুমি? কি চাও?"

বাবুটীর ভাবভঙ্গী আর কণ্ঠস্বর যে প্রকার, দেখলে শুনলে উত্তর কোত্তে ইচ্ছা হয় না, তথাপি আমি ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেম, "চাই না কিছু, আমি হরিদাস; নরহরিবাবু এসেছেন কি না, জানতে এসেছি।"

পূর্ব্ববৎ তীব্রস্বরে বাবু বোল্লেন, "কেন? তার কাছে তোমার কি দরকার? তিনি এখন আসবেন না, পৌষমাসের শেষে আসবেন।"

আর আমি কথা কইলেম না, সেখানে আর দাঁড়ালেমও না, তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলেম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি, একজন চাকর উপরে উঠছিল, তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বাবুটীর নাম কি?" চাকর বোল্লে, "কানাইবাবু, বীরভূমের বাণেশ্বরবাবুর ভাগ্নে।"

শিউরে উঠে, অবাক হয়ে আমি নেমে এলেম। তখন আমার মনে যে কি ভাবের উদয় হলো, অন্তর্যামীই জানতে পাল্লেন।

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আমি মনিববাড়ীতে এসে পৌঁছিলেম। [...] ভাবনা আমাকে পরিত্যাগ কোরে যেতে চায় না। অন্যমনস্ক হবার জন্য যতই চেষ্টা করি, ততই নূতন নূতন ভাবনা এসে জোটে। [...] নরহরিবাবুর তত্ত্ব নিতে গিয়ে শুনে এলেম, কানাইবাবু! মনটা ঝাঁৎ কোরে উঠলো। যে রাত্রে আমি মেয়েমানুষ সেজে পালাই, নূতন লোকের হাতে ধরা পড়ি, সেই রাত্রে বাণেশ্বরবাবুর চাকরেরা হাসির তুফান তুলে যে কানাইবাবুর নাম কোরেছিল, এই সেই কানাইবাবু! ইনি বাণেশ্বরবাবুর ভাগ্নে হন, ইনি আপন মাতুলকন্যাকে কুলকলঙ্কিনী কোরেছেন, অন্যলোকের দ্বারা কৌশলে সেই কন্যাটিকে ঘরের বাহির কোরেছেন! সে রাত্রে সেখানে কানাইবাবুকে আমি দেখি নাই, কলিকাতায় দেখলেম। মুখের ভাব আর কথার ভাব যে রকম, তাতে কোরে বিশ্বাস হলো, সত্যই তিনি সেই পাপকার্য্যের নায়ক! বাহাদুর পুরুষ বটে! নায়িকাটিকে কলিকাতায় এনেছেন কি না, বলা যায় না; অনুমানে বোধ হয়, এনে থাকবেন। কলিকাতা সহর যে রকম জায়গা, ঐ প্রকার কার্য্যের সুবিধাই এখানে বিস্তর। কে কোথায় কি ভাবে আছে, কি ভাবে থাকে, অন্যলোকে কিছুই জানতে পারে না; পোষাক-পরিচ্ছেদে, কথার আলাপে, বাহিরে বেশ ভদ্রলোক, ভিতরে ভিতরে নরককুণ্ড! [...]

[...] সন্ন্যাসীরা নিত্য নিত্য দেখা দেয়, নাচে, গায়, শ্লোক পড়ে, কেচ্ছা ঝাড়ে, নিত্যই নূতন রঙ্গ। এক বাড়ীতে নয়, পাড়ায় পাড়ায় দশবাড়ীতে বেড়ায়, যেখানে সুবিধা পায়, সেইখানে বুজরুকী জানায়, শক্তলোকের কাছে জায়গা পায় না। [...] একদিন সকালবেলা বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় সবেমাত্র আমি বেরিয়েছি, খানিক দূরে ভারী একটা গোলমাল উঠলো। কিসের গোলমাল, কিছুই ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। রাস্তা দিয়ে অনেক লোক ছুটে ছুটে যাচ্ছে, "কোথায় খুন?—কোথায় খুন?—কোন বাড়ীতে খুন?" এই সব কথা বোলছে আর ছুটছে। খুনের কথায় ভয় পেয়ে ছুটে আমি বাড়ীর ভিতর চোলে গেলেম, বাবুদের কাছে সেই সব কথা বোল্লেম। লোকের বিপদে সম্পদে অগ্রসর হওয়া বড়বাবুর চিরদিন অভ্যাস, শশব্যস্তে তিনি একটা জামা গায়ে দিয়ে উদ্বিগ্নচিত্তে বাড়ী থেকে বেরুলেন; জামার বোতাম দিবার অবসর হলো না, যেদিকে গোলমাল হোচ্ছিল, রাস্তার লোকেরা যেদিকে ছুটছিল, অত্যন্ত দ্রুতপদে তিনি সেই দিকে যেতে লাগলেন। তখন একটু সাহস পেয়ে আমিও তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্লেম।

ভয়ঙ্কর ব্যাপার! যে বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজা হয়েছিল, সেই বাড়ীর দরজার সম্মুখেই ভয়ঙ্কর গোলমাল। বহুলোক একত্র জমায়েত, পুলিশ জমায়েত, রৈ রৈ কাণ্ড! সেই বাড়ীতেই খুন! অন্দরমহলে কর্ত্তার একটী কন্যার ঘরে রেতের বেলা খুন

৩০০ পৃষ্ঠার পর

বিবেচনা করলে 'হরিদাস' নামের যেমন কোনো গৌরব বা মহিমা নেই, তেমনি তার কাহিনিরও। কথাটি যে অযৌক্তিক নয়, তার সমর্থনে প্রচলিত একটি ছোটমতো প্রবচনতুল্য ছড়ার উল্লেখই যথেষ্ট। এখানে হরিদাস হয়ে যায় 'হরিদাস পাল', আর তার আগের পঙ্‌ক্তিতে ব্যবহৃত অন্ত্যমিলের শব্দটি কেবল তাচ্ছিল্যসূচক নয়, উচ্চারণ-অযোগ্যও বটে—কেননা সেখানে গুপ্তকেশের দেশজ গালিবাচক প্রতিশব্দ স্থান পেয়েছে—অবশ্য শব্দটি হিন্দিতে 'বুলি' হলেও বাংলায় তা অশিষ্ট শব্দ হিসেবেই পরিচিত। তবে আমাদের এই কাহিনির হরিদাস তার অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি-দর্শনের ভেতর দিয়ে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে ধারণা অর্জনের সুযোগ পেয়েছে, তাকে তুচ্ছ বা মূল্যহীন মনে করার কোনো কারণ নেই। সেই নিরিখে তার বিবরণ তাই হয়ে উঠেছে 'আধুনিক বঙ্গের সমাজচিত্র'।

হরিদাসের গুপ্তকথা সেকালের সাড়া-জাগানো বই। ভুবনচন্দ্র, না উপেন্দ্রকৃষ্ণ—এই লেখক-বিতর্ক বইটির প্রচারে সহায়তা করেছিল—এমন ধারণাও হয়তো অসংগত নয়। লেখক বইটিকে 'নবন্যাস' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। উপন্যাসের উপকরণ কিছু থাকলেও পুরোপুরি একে উপন্যাস হিসেবে গণ্য করা যায় না। ভ্রমণচিত্র, নকশা, আত্মকথা ও উপন্যাসের মিশ্র রূপের সংকর-সৃষ্টি *হরিদাসের গুপ্তকথা*। নামকরণে 'গুপ্তকথা' শব্দটি যুক্ত হলেও এতে এমন কোনো ঘটনা বা বিবরণ নেই, যাতে নামকরণের সার্থকতা বা যথার্থতা নিরূপণ করা চলে। এ-ও পাঠককে প্রলুব্ধ করার একটা ফিকির মাত্র। এ বইয়ের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা হলো সমাজচিত্র হিসেবে—উনিশ শতকের অন্যতম বৃহৎ উপন্যাস হিসেবে—আর কথ্য বাংলায় লেখা বই হিসেবে।

এক ভাগ্যবিড়ম্বিত নিরাসক্ত উদাসীন মানুষ হরিদাসকে কেন্দ্র করেই মোটের ওপর এই উপাখ্যানের কাহিনি আবর্তিত। হরিদাসের বিবৃতিতে কাহিনি এগিয়ে চলেছে সহজ-সরলভাবেই—রুচিৎ কোনো নাটকীয়তা কিংবা রোমাঞ্চ-রহস্য কাহিনিকে জমিয়ে তুলেছে। হরিদাস চলতি-পথে যা দেখেছে, তারই বিবরণ স্থান পেয়েছে এখানে। ভ্রমণকারী হরিদাস কেবল বাংলা মুলুকে নয়, বাংলার বাইরেও নানা জায়গায় গেছে। বাংলার কলকাতা, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, মানিকগঞ্জ, ত্রিপুরা এবং আরও কোনো কোনো জায়গায় আর সেই সঙ্গে বাংলার বাইরে আসামের কামরূপ-কামাখ্যা, পাটনা, এলাহাবাদ, কাশী, গুজরাট—এসব নানা জায়গায় তাকে যেতে হয়েছে। তার অনুসন্ধিৎসা, অনুমান ও পর্যবেক্ষণশক্তির প্রশংসা করতে হয়—দুচোখ মেলে সে দেখেছে এসব অঞ্চলের জনজীবনের ছবি। সামান্য ভালো মানুষের পাশাপাশি গুন্ডা, ডাকাত, তস্কর, ঠগ, ভণ্ড, প্রতারক, দালাল, বেশ্যা, বাইজি, কুলটা—নানা কিসিমের আধার-জগতের মানুষকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। হরিদাস দেখেছে কথিত ভদ্রসমাজের মুখ ও মুখোশের স্বরূপ—অনাচার, ব্যভিচার, অবিচার, অমানবিকতা, শঠতা, তঞ্চকতার কত রকমফের। মানবচরিত্র যে কত বিচিত্র ও রহস্যময়—সেই বিষয়টি জানার সুযোগও

বাকি অংশ ৩০২ পৃষ্ঠায়

হয়েছে! কি রকমে কি হলো, কিছুই ঠিকানা হোচ্ছে না।

অগ্রে একটু পরিচয় আবশ্যক, তারপর খুনের বৃত্তান্তটা আলোচনা করা যাবে। বাবুর নাম বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী। বিশ্বেশ্বরবাবুর এক পুত্র, তিন কন্যা। পুত্রের নাম হরিবিলাস, কন্যাদের নাম নিতম্বিনী, কাদম্বিনী, সৌদামিনী। তিনটী কন্যাই বিবাহিতা, তিনটীই সধবা। সৌদামিনী সর্ব্বকনিষ্ঠা। সৌদামিনী কখনো শ্বশুরবাড়ী যায় নাই। পূর্ব্বদেশে শ্বশুরবাড়ী; শ্বশুর গরিব, স্বামী মূর্খ, তাতে দূরদেশ, এই কারণেই সৌদামিনী চিরদিন বাপের বাড়ীতেই থাকে। বৎসরে দুই একবার স্বামী আসে, মান পায় না, আদর পায় না, দু-পাঁচদিন থেকেই চলে যায়। সৌদামিনীর সন্তান হয় নাই, কিন্তু সন্তানকামনায় সৌদামিনী অনেক রকম ব্রত করে ঠাকুর-দেবতাদের কাছে মানত করে, নানা রকম ঔষধ খায়, সন্তান হয় না। সেই সৌদামিনীর ঘরেই খুন হয়েছে! [...]

পুলিশের তদন্ত আরম্ভ হয়েছে। [...] আমি বড়বাবুর সঙ্গেই গিয়েছিলেম, বাবুর খাতিরে অবাধে আমিও যেতে পেলেম; গিয়ে শুনলেম, সৌদামিনীর ঘরে একজন সন্ন্যাসী খুন হয়েছে।

যে পাঁচটা সন্ন্যাসী মাসাবধি নেচে গেল, বুজরুকী জানিয়ে জোড়াসাঁকো পল্লীতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, [...] কাটা পোড়েছে, তাদেরি মধ্যে একজন। সন্ন্যাসীদের নাম সর্ব্বদা প্রকাশ হয় না, কিন্তু এ সন্ন্যাসীর নাম পাওয়া গিয়েছে, সৌদামিনীই নাম বোলেছে। সৌদামিনী গৃহস্থকন্যা, সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার কিসের আলাপ, সৌদামিনী কি প্রকারে সন্ন্যাসীর নাম জানতে পাল্লে সে কথাও একটু বলা দরকার। সৌদামিনী পুত্রকামনা করে, মহাপুরুষ সন্ন্যাসী এসেছে, বন্ধ্যা-নারীকে ছেলে দেয়, বোবালোকের কথা ফুটায়, অসাধ্য ব্যাধি আরাম করে, কাঁসাপিতলকে সোনা করে, এই সকল গুণের পরিচয় শুনে পিতাকে বোলে কোয়ে সন্ন্যাসীকে অন্দরমহলে নিয়ে গিয়েছিল, সৌদামিনীর রূপ দেখে সন্ন্যাসী মোহিত হয়, হাত দেখে মুখ দেখে, কপালের রেখা দেখে সন্ন্যাসী বলে, "তোমার ভাগ্য ভাল, তুমি তিন পুত্রের জননী হবে। তোমার জন্য আমি একটী যজ্ঞ কোরবো, সে যজ্ঞ সাতদিনে পূর্ণ হয়, যজ্ঞস্থলে তোমাকে উপস্থিত থাকতে হবে, তোমাদের বাড়ীর ভিতরেই যজ্ঞকুণ্ড প্রতিষ্ঠা কোরবো।" [...] নিশা-কালেই যজ্ঞ। হোমকুণ্ড-সমীপে চন্দনচর্চ্চিত হয়ে, তুলসীমাল্য ধারণ কোরে, কপালের উপর চূড়াবাঁধা খোঁপাটা এলিয়ে পৃষ্ঠের দিকে ফেলে, সেই কৃষ্ণ-সন্ন্যাসী যজ্ঞ কোত্তে বোসতো, পাশে থাকতো সৌদামিনী। প্রথম রাত্রে যখন সঙ্কল্প হয়, তখন উভয়ের নামে মন্ত্রপাঠ করা হয়েছিল, তাতেই সৌদামিনী শুনেছিল;—শুনেছিল আর জেনেছিল, সন্ন্যাসীর নাম রমাই সন্ন্যাসী। [...] যজ্ঞ কিন্তু পূর্ণ হয় নাই, দুদিন বাকী ছিল, পঞ্চম রজনীতেই কর্ম্ম ফর্সা! বৃহৎ একখানা বঁটীর আঘাতে রমাই সন্ন্যাসীর প্রাণপক্ষী ছটফট কোরে বেরিয়ে গিয়েছে; ভেঙে দুখানা হয়ে হোমকুণ্ডের ধারে দেহপিঞ্জরটা পোড়ে আছে! [...] একঠাঁই সন্ন্যাসীর মুণ্ড, একঠাঁই ধড়। এক কোপে গলাকাটা। [...]

[...] সন্ন্যাসীর দলে ভণ্ডসন্ন্যাসীই বিস্তর। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, কিন্তু কোন প্রকার কুকার্য্য তাদের বাকী নাই। কথার ছলনে মেয়েমানুষ ভুলায়, মেয়েমানুষের সঙ্গে নির্জ্জনে কথা কয়, একসঙ্গে নির্জ্জনে থাকে, ছেলে হবার ঔষধ দেয়, এ সব কাজ যারা কোত্তে পারে, তারা কি একটু মদ খেতে পারে না? কি তারা পারে না? সন্ন্যাসীরা গৃহস্থের ঘটী-বাটী চুরি করে, সোনা করার লোভ দেখিয়ে কৌশলে সর্ব্বস্ব চুরি করে, ভদ্রলোকের জাতিকুল নষ্ট করে, কি তারা করে না? ছেলেমানুষ আমি, কিন্তু একবার আমি শুনেছিলেম, ভস্মমাখা একটা শিব-সন্ন্যাসী কোথাকার এক বড়মানুষের সাত দেউড়ীর ভিতর থেকে এটী টুকটুকে বউ বাহির কোরে নিয়ে কোন দেশে পালিয়ে গিয়েছিল।

সন্ন্যাসীদের উপর আমার ঘৃণা ছিল, সে ঘৃণাটা আরো বেড়ে উঠলো। কেবল সন্ন্যাসীর উপরে কেন, সহরের উপরেই ঘৃণা বাড়লো। কলিকাতায় আর থাকা হবে না, এ অঞ্চলে আর থাকবো না, পশ্চিমদেশে চোলে যাই; সে দেশে অনেক তীর্থস্থান আছে, সম্পর্কশূন্য উদাসীন নিরাশ্রয় আমি, তীর্থে তীর্থে দেবদর্শন কোরে, যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবো। সহরেই পাপ, সহরেই দুষ্ক্রিয়া, সহরেই মানুষ খুন, সহরেই ব্যভিচার, সহরে থাকা আমার পক্ষে ভাল নয়। আমার মত অবস্থায় সহরে যারা তাকে, মনে হয় কখনই তারা চরিত্র রাখতে পারে না। সব আমি হারিয়েছি, অনেক কষ্টই পেয়েছি, ভগবান রক্ষা করেন, দোহাই ভগবানের, চরিত্রটী আমি হারাব না, হারাতে পারবোই না। [...]

কাশীধাম

কোথায় আমি যাব, অপরে কি জানবে, নিজেই আমি জানি না। কিছুই ঠিক নাই। ঠিক নাই, অথচ আমি কলিকাতার নূতন আশ্রয়টী পরিত্যাগ কোল্লেম। মনে বড় ভয়, কখন কোথায় কি বিপদ ঘটে, কখন দুর্ব্বিপাকে বৈরিহস্তে ধরা পড়ি, সেই ভয়ে প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, স্থলপথে যাব না, জলপথেই বরাবর দূরদেশে চোলে যাব। জানা ছিল, বড়বাজারের ঘাটে সর্ব্বক্ষণ নৌকা পাওয়া যায়; ভোরে ভোরে ভোঁ ভোঁ কোরে ছুটে ছুটে বড়বাজারের ঘাটে পৌছিলেম। যে সকল নৌকা পশ্চিম অঞ্চলে যায়, তারি একখানা ভাড়া কোরে আমি পশ্চিমদেশে চোল্লেম। দাঁড়ী-মাঝীরা বদর বদর মন্ত্রে নৌকা ছেড়ে দিলে। আট

৩০১ পৃষ্ঠার পর

মিলেছে তার।

হরিদাসের কলকাতার অভিজ্ঞতার সামান্য ইঙ্গিত আগে এখানে দিয়ে নিই। উনিশ শতকে কলকাতা ছিল বেশ্যা-বাইজি-খানকি-খেমটার শহর। ছয় মাস কলকাতায় থাকার পর চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা হলো হরিদাসের। তার মুখেই শোনা যাক সেই বৃত্তান্ত: "...কোজাগর-পূর্ণিমার দিন বেকালে আমি একাকী চিৎপুর রোডে বেড়াতে বেরিয়েছিলেম।...গরাণহাটা থেকে কলুটোলা-রাস্তা পর্য্যন্ত বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখলেম, দুধারি বারান্দায় বারান্দায় রকমারি মেয়েমানুষ। রকমারি বর্ণের কাপড়পরা, রকমারি ধাতুর গহনাপরা, রকমারি ধরনের খোঁপাবাঁধা, অনেক রকম মেয়েমানুষ। কেহ কেহ টুলের উপর বোসে আছে, কেহ কেহ চেয়ারে বোসেছে, কেহ কেহ রেলিঙের উপর বুক রেখে ভানুমতী-ধরনের মুখ বাড়িয়ে রাস্তার দিকে ঝুলছে; কারো বুকে রঙদার কাঁচুলী, কারো কারো মুখে রংমাখা, কারো খোঁপা নাই, পৃষ্ঠদেশে দীর্ঘবেণী, কেহ কেহ এলোকেশী। কারা এরা? লোকমুখে শুনেছিলেম, কলিকাতা সহরে বেশ্যা অনেক; যে সকল পণ্ডিত সাধুভাষায় কথা কন, তাঁরা বলেন, বেশ্যা মানে নগরবিলাসিনী বারাঙ্গনা; সুখবিলাসী মতিচ্ছন্ন যুবাদলের ইহকাল পরকাল ভক্ষণ করে।...চিৎপুর রোড এই সকল ফাঁদে আচ্ছন্ন।...কলিকাতার বেশ্যানিবাসের প্রণালীটী অতি জঘন্য। গৃহস্থের বাড়ীর কাছে বেশ্যা, ছেলেদের পাঠশালার পাশে বেশ্যা, ডাক্তার-কবিরাজের আবাসের পাশে বেশ্যা, কোথাও বা ভদ্রমানুষের মাথার উপর বেশ্যা; অধিক কথা কি, ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরের আষ্টে-পৃষ্ঠে বেশ্যা।' আমাদের নীতিনিষ্ঠ হরিদাস অন্তরে বেশ্যাবাজি সম্পর্কে বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা পোষণ করলেও তার বর্ণনাটি দিয়েছে বেশ খাসা। সাত্ত্বিক হরিদাস বয়স্কা মাতৃস্থানীয়া হলেও কোনো রমণীর রূপ-বর্ণনায় কখনো অনাগ্রহ পোষণ করেনি। কিশোরী-তরুণী দেখে তার হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি পেয়েছে—আলাপ জমানোর সুযোগ নষ্ট করেনি—একটা প্রেম প্রেম ভাব মনের মধ্যে বেশ ভালোই জেগে উঠেছে।

নগরনটীর প্রসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কথা যখন উঠল, তখন এই সমাজ বিষয়ে হরিদাসের মনোভাব কেমন ছিল, তা জেনে নেওয়া যাক। হরিদাস তখন কিছুদিনের জন্য বাসা বেঁধেছে কলকাতার বাহির-মির্জাপুরে। এখানে তার সঙ্গে দেখা হয় এক ব্রাহ্মভক্তের। কথা প্রসঙ্গে সেই ব্রাহ্ম-অনুসারীর উদ্দেশে হরিদাস বলে: 'রাজা রামমোহন রায় যে উদ্দেশ্যে, যে মূলের উপর নির্ভর কোরে কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন সে উদ্দেশ্য এখন বিফল, সে মূল এখন বিপর্য্যস্ত; ব্রহ্মজ্ঞান যেন বাজারের পণ্যবস্তু, বালকের ক্রীড়ার বস্তু। হিন্দুসমাজের আচারব্যবহার আজকাল স্বেচ্ছাচারে পরিণত।' ব্রাহ্মসমাজের অনবক্ষয়-অসংগতি হয়তো দেখা কিছু দিয়েছিল সেই সময়ে, সে

বাকি অংশ ৩০৩ পৃষ্ঠায়

দাঁড়ে অতি দ্রুত তরণীখানি গঙ্গা-তরঙ্গে ছুটে ছুটে চোল্লো। বাগবাজারের সীমা যখন ছাড়িয়ে গেল, পূর্ব্বগগনে সূর্য্যদেব তখন অল্পে অল্পে উঁকি মাত্তে লাগলেন।

গঙ্গার দুধারে যে সকল স্থান, মাঝীকে জিজ্ঞাসা কোরে সেই সকল স্থানের নাম জেনে নিতে লাগলেম। যে স্থানগুলি প্রসিদ্ধ, সেইগুলির নাম মনে থাকলো, ছোট ছোট গ্রামের নাম মনে কোরে রাখতে পাল্লেম না। বালী, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী, চন্দননগর ছাড়িয়ে হুগলীতে নৌকা পৌছিল। বেলা এগারটা। চন্দননগরে একবার নেমেছিলেম, ছোট সদর, কিন্তু মন্দ নয়। চন্দননগরের নূতন নাম ফরাসডাঙ্গা; এই স্থানটী ফরাসীদের অধিকারে; এখানে ইংরেজের আইন-কানুন চলে না, লোকের মুখে শুনলেম, ইংরেজের অধিকারে নরনারী হত্যা, চুরি-ডাকাতী, জালিয়াতী ইত্যাদি বড় বড় অপরাধ কোরে যারা ফরাসডাঙ্গায় আশ্রয় লয়, ফরাসী গবর্ণরের অনুমতি ব্যতিরেকে ইংরেজ পুলিশ সে সকল অপরাধীকে গ্রেপ্তার কোত্তে পারে না। আরও শুনলেম, ফরাসী অধিকারে বাঙ্গালী গৃহস্থ প্রজারা অনেক প্রকার সুখে আছে।

হুগলীতে উত্তীর্ণ হয়ে স্নানাহার সমাপন কোল্লেম, দাঁড়ী-মাঝীরাও স্নানাহার কোরে নিলে; গঙ্গায় তখন ভাটা; জোয়ার আরম্ভ হোলে নৌকা-ছাড়া হবে, মাঝীরা আমাকে এই কথা জানালে; জোয়ার আসবার বিলম্ব আছে। এক প্রকার হলো ভাল। হুগলীটী প্রাচীন কুঠী, প্রাচীন সহর, বেড়িয়ে বেড়িয়ে সেখানকার বাজারহাট আমি দেখলেম। বেশী বিলম্ব হবে বোলে আদালতগুলি দেখা হলো না। সুখের আসা নয়, সুখের যাত্রা নয়, দুরন্ত রাক্ষসের ভয়ে কলিকাতা পরিত্যাগ। পরিহিত বস্ত্র শীতকালের গাত্রবস্ত্র আর টাকাগুলি ব্যতীত দূরপথে ভ্রমণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিছুই সঙ্গে ছিল না, হুগলীর বাজারে লেপ, তোষক, বালিশ আর কয়েকখানি তৈজসপত্র কিনে নিলেম; বেলা যখন আড়াইটে, সেই সময় নৌকাছাড়া হলো।

দিবারাত্রি নৌকা চোলতে লাগলো, অষ্ট প্রহরের মধ্যে অল্পক্ষণ মাত্র বিরাম। ক্রমশঃ শান্তিপুর, কালনা, কাটোয়া ইত্যাদি স্থান অতিক্রম কোরে অনেক দূরে গিয়ে পোড়লেম। শান্তিপুরে নেমেছিলেম; শান্তিপুর একটী সুবিখ্যাত গণ্ডগ্রাম; সহর বোল্লেও সাজে। শান্তিপুরে বহুলোকের বাস; হাটবাজারও বেশ গুলজার; সেখানে দেখবার জিনিস অনেক আছে। শুনলেম, কার্ত্তিক মাসে রাসের সময় শান্তিপুরে মহাসমারোহ হয়। কালনাতেও নেমেছিলেম; সেখানে বর্দ্ধমানের মহারাজের অনেকগুলি দেবালয় আছে; সারি সারি অনেক মন্দির; এখানকার প্রধান বিগ্রহ লালজী। অতি সুন্দর নবরত্নমন্দির লালজী বিরাজমান। লালজীর সেবা ও লালজীর বাড়ীর অতিথি-সেবার বন্দোবস্ত অতি উত্তম। [...]

কলিকাতার বড়বাজারে ঘাট থেকে কদিনে রাজমহলে নৌকা পৌছেছিল, সেটা আমার ঠিক মনে নাই; শীঘ্র শীঘ্র কাশী যাব, ইহাই আমার আকিঞ্চন; রাজমহলে নেমে পাহাড়গুলি ভাল কোরে দেখা হলো না। নৌকা চোল্লো। সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা ছাড়িয়ে পোড়লেম। ভাগলপুর ছাড়িয়ে একটা পাহাড় দেখা গিয়েছিল, সে পাহাড়টার নাম জাংরের পাহাড়;—জলের মাঝখানে যেমন দ্বীপ থাকে, এটাও প্রায় সেইরূপ; বোধ হয় যেন, জলের ভিতর থেকেই পাহাড় উঠেছে। প্রবাদ এইরূপ যে, জহ্নুমুনি এখানে গঙ্গা পান কোরেছিলেন। তদবধি গঙ্গার একটী নাম জাহ্নবী।

পাটনা সহরটী অতি সুন্দর। পাটনার প্রাচীন নাম পাটলীপুত্র। এই স্থান থেকে গণ্ডকী নদীর মোহনা দেখা যায়। পাটনার পর দানাপুর, আরা, বক্সার, তারপর গাজীপুর। গাজীপুরের গোলাপ অতি প্রসিদ্ধ। কৌতুকে কৌতুকে কত স্থান দেখতে দেখতে চোল্লেম; আটদিন পরে কাশীর ঘাটে নৌকা পৌছিল।

কোথাকার পাপ কোথায়?

[...] রবিবার বৈকাল। বড়বাবু যেমন বন্ধুর বাড়ী যান, সেইরূপে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন, যজ্ঞেশ্বর আমার কাছে এলো। চেয়ে দেখলেম, যজ্ঞেশ্বরের মুখে মৃদু মৃদু হাস্য খেলা কোচ্ছে, আমিও মৃদু মৃদু হাস্য কোল্লেম। যজ্ঞেশ্বর বোল্লে, "সব ঠিক; প্রস্তুত হও; বিলম্ব করা হবে না, সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসতে হবে।"

প্রস্তুতই আমি ছিলেম, বৈঠকখানার দরজা বন্ধ কোরে যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে আমি বাড়ী থেকে বেরুলেম। কোথায় যাচ্ছি, কেহ কিছু জানতে পাল্লে না। ছোট ছোট গলী পার হয়ে যজ্ঞেশ্বর আমাকে একটা পল্লীর দিকে নিয়ে চোল্লো। [...] দিবাশেষে বসন্তের শীতল বাতাস ধীরে ধীরে প্রবাহিত হোচ্ছিল, বায়ুস্পর্শে আমি সুখানুভব কোচ্ছি, পল্লীর দুই ধারে নূতন নূতন দৃশ্য দর্শন কোচ্ছি, নয়ন পুলকিত হোচ্ছে। নূতন দৃশ্যাবলীর মধ্যে এক দৃশ্য আমার চক্ষে খুব নূতন।

সারি সারি দোতালা বাড়ী, রাস্তার দিকে বারান্দা; সুসজ্জিতা সুন্দরী সুন্দরী অনেকগুলি কামিনী সেই সকল বারান্দা আলো কোরে বোসে আছে; বারান্দায় এক এখানি চৌকি পাতা, চৌকির উপর গদীপাতা বিছানা, গদীর উপর তাকিয়া, তাকিয়ার কোলে কামিনী। পার্শ্বে দীর্ঘ দীর্ঘ নলশোভিত রূপার আলবোলা। কামিনীরা পেশোয়াজ পরা, বক্ষে কাঁচুলী, কারো কারো বিচিত্র আস্তিনযুক্ত আংরাখা, তার উপর বিচিত্রবর্ণের ওড়না, জামার উপর উজ্জ্বল উজ্জ্বল অলঙ্কার, নাসিকায় মুক্তার নোলক দোদুল্যমান, কর্ণে বিবিধাকার কর্ণভূষা, কপালে সিঁথির সঙ্গে গাঁথা সোণার

৩০২ পৃষ্ঠার পর

কথা মেনে নিয়েও বলা যায়, হরিদাসের ব্রাহ্মবিদ্বেষ এখানে প্রচ্ছন্ন থাকেনি।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হরিদাস পূর্ববঙ্গেও এসেছিল—সফর করেছে ঢাকা, মানিকগঞ্জ, ত্রিপুরা। 'বাঙালে'র দেশে 'ঘটি'র কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতাও হয়েছিল।

মানিকগঞ্জে তাকে আসতে হয়েছিল তার ভালোবাসার মানুষ অপহৃতা অমরকুমারীর খোঁজে। একই সূত্রে তার ঢাকা-ভ্রমণ। ঢাকার কিছু বিবরণ তার বর্ণনায় পাওয়া যায়। তবে বুড়িগঙ্গা—বিশেষ করে, পদ্মার কথা বিশদ বলেছে। পদ্মার কথা বলতে গিয়ে আবার তার শাখানদী গৌরী বা গড়াইয়ের কথাও এসেছে। এই সুবাদে গৌরীর উৎসকথার একটি লোকপ্রচলিত কিংবদন্তির কাহিনিও শুনিয়েছে। ত্রিপুরার রুদ্রাক্ষ নামের এক প্রান্তিক গ্রামে তাকে কৌশলে নেশা করিয়ে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে এক পুরোনোকালের প্রায় পোড়োবাড়িতে আটক করে রাখা হয়। এখানে সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। ভূতের ভয় দেখিয়ে মানুষকে সন্ত্রস্ত করে ব্যভিচার আর পরকীয়ার অবাধ লীলার এক রোমাঞ্চকর কাহিনির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে মূলত হরিদাসের সাহস-বুদ্ধি-কৌশলের ভেতর দিয়ে।

পাপ যেন হরিদাসকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। তাই সে অসহায় ভঙ্গিতে বলে: 'কোথাকার পাপ কোথায়?...আমার চক্ষেই বা সে সকল পাপ পতিত হয়? বীরভূমের পাপ রক্তদন্ত, সে পাপ গেল কলিকাতায়; কলিকাতা থেকে আমি পালিয়ে এলেম, সে পাপ এলো কাশীতে।' হরিদাস হিন্দুদের ধর্মতীর্থ কাশীতে গিয়ে প্রবাসী বাঙালিদের যে অধর্মের পরিচয় পায়, তাতে বিস্মিত হতে হয়। সেই কলুষিত অধ্যায়ের বিবরণে জানা যায়: 'কাশীধাম কি ইদানী নানা পাপের আশ্রয়স্থান হয়ে পোড়েছে? লোকের মুখে যে রকম শুনতে পাওয়া যায়, সে প্রমাণে এরূপ কলঙ্কই যেন সত্য বোধ হয়। বাঙ্গালীদলের বেশী কলঙ্ক। জাতিতে জাতিতে, জাতিতে-বিজাতিতে, সম্পর্কে সম্পর্কে, সম্পর্কে নিঃসম্পর্কে, বাঙ্গালী নর-নারী পাপলিপ্ত হোলেই নিরাপদের আশাতে কাশীতে পালিয়ে আসে; মাতুলের ঔরসে ভগিনী-পুত্রী, পিতৃব্যের ঔরসে ভ্রাতৃকুমারী, ভ্রাতার ঔরসে বিমাতৃকুমারী, ভাগিনেয়ের ঔরসে মাতুলানী, জামাতার ঔরসে শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী, শ্বশুরের ঔরসে যুবতী পুত্রবধূ গর্ভবতী হোলেই কাশীধামে পালিয়ে আসে।'

হরিদাসের পেটে যেসব গুপ্তকথা জমে ছিল, তা উগরে দিতে সে কুণ্ঠা বোধ করেনি। কলঙ্ক আর পাপ যে কেবল বারাঙ্গনার আলয়ে স্থান নিয়েছিল তা নয়, নামীদামি সংসারের ভেতরেও সাদরে সে লালিত হয়েছে। সাধু-সন্ন্যাসীর পাপের মুখোশ টেনে খুলে দিতেও দ্বিধা করেনি হরিদাস। আর কথিত এই সব শাস্ত্রবাহক ধর্মাচারী অনাচারের মাশুল দিয়েছে

বাকি অংশ ৩০৪ পৃষ্ঠায়

ঝাঁপা, কোলে কোলে মুক্তার ঝালোর, মস্তকের কেশপাশ ললাটের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত পেটেপাড়া, পৃষ্ঠেভাগে বৃহৎ চক্রাকার খোঁপাবাঁধা, এক একটী কবরী মনোহর পুষ্প-মাল্যে বিজড়িত; নয়নে অঞ্জন, ওষ্ঠে মিসি, হস্তে আতরমাখা এক একখান রুমাল, আলতাপরা পায়ে মোটা মোটা গোল মল; অপরূপ খোলতা। অধিকাংশই হিন্দুস্থানী, কতক কতক বাঙ্গালী, বসন-ভূষণে শীঘ্র প্রভেদ করা যায় না; সকলেই হিন্দুস্থানী বেশভূষা, সকলেরই একপ্রকারে কেশবিন্যাস; চমৎকার শোভা। বর্ণ ত্রিবিধ;—কতক গৌরাঙ্গী, কতক শ্যামাঙ্গী, কতক কৃষ্ণাঙ্গী। যেগুলি গৌরাঙ্গী, সেগুলিকে যেন চিত্রকরা পরীবালা অথবা সুরবালা বোলে ভ্রম হয়। যজ্ঞেশ্বরকে জিজ্ঞাসা কোরে পরিচয় পেলেম, ঐ সকল বিলাসিনী কামিনীদের সাধারণ উপাধি বাইজী। হিন্দুস্থানীও বাইজী, বাঙ্গালীও বাইজী; কেবল উপাধিতে বাইজী নহে, সকলেই সুনিপুণা নর্ত্তকী। বাইজীরা সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রসঙ্গীতে ও কণ্ঠসঙ্গীতে সুশিক্ষিতা। এ মহলে যবনী বারাঙ্গনারা স্থান পায় না; সিক্রোলের পথে যবনী গণিকাদের একচেঠে বাহার। তারাও নৃত্য-গীত-বাদ্যে যশস্বিনী। [...]

সন্ধ্যা হবার অতি অল্প বিলম্ব। কামিনীর মা বেরিয়ে গেল, আমিও যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে রাস্তায় বেরুলেম। যে সময় পূর্ব্বকথিত বাইজীগুলির আরো অধিক নয়নমোহিনী শোভা। এক এক বারান্দায় সেতার-বেহালাযোগে সুমধুরকণ্ঠে সুস্বরলহরী হিল্লোলিত হোচ্ছি, শ্রবণে শ্রবণ-মন বিমুগ্ধ হয়, অল্পক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে একটী গীতের অর্দ্ধেকটুকু আমি শুনলেম, শেষ পর্য্যন্ত শোনবার অবকাশ হলো না। বড়বাবু সন্ধ্যার পরেই ফিরে আসেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী যাওয়া আবশ্যক, সঙ্গীতশ্রবণের আশাকে মনোমধ্যে গুপ্ত রেখে যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে আমি বাড়ীর দিকে চোলে এলেম। [...]

[...] কোথাকার পাপ কোথায়? সংসারে নিঃসম্পর্ক সামান্য একজন বালক আমি, আমার চক্ষেই বা সে সকল পাপ কেন পতিত হয়? বীরভূমের পাপ রক্তদন্ত, সে পাপ গেল কলিকাতায়; কলিকাতা থেকে আমি পালিয়ে এলেম, সে পাপ এলো কাশীতে! আমার সম্বন্ধে মোহনলালবাবুও এক পাপ; অমরকুমারীকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য সে পাপ এসেছিল কাশীতে! কলিকাতার পাপ সৌদামিনী, খুনে-পাপী জয়হরি বড়াল, আমার অশান্ত চিত্তকে আরো অশান্ত করবার জন্য সে পাপ এলো কাশীতে! কাশীধাম কি ইদানীং নানা পাপের আশ্রয়স্থান হয়ে পোড়েছে? লোকের মুখে যে রকম শুনতে পাওয়া যায়, সে প্রমাণে ঐরূপ কলঙ্কই যেন সত্য বোধ হয়। বাঙ্গালীদলের বেশী কলঙ্ক। জাতিতে জাতিতে, জাতিতে বিজাতিতে, সম্পর্কে সম্পর্কে, সম্পর্কে নিঃসম্পর্কে, বাঙ্গালী নর-নারী পাপলিপ্ত হোলেই নিরাপদের আশাতে কাশীতে পালিয়ে আসে; মাতুলের ঔরসে ভগিনী-পুত্রী, পিতৃব্যের ঔরসে ভ্রাতৃকুমারী, ভ্রাতার ঔরসে বিমাতৃকুমারী, ভাগিনেয়ের ঔরসে মাতুলানী, জামাতার ঔরসে শ্বশ্রুঠাকরাণী, শ্বশুরের ঔরসে যুবতী পুত্রবধূ গর্ভবতী হোলেই কাশীধামে পালিয়ে আসে! গর্ভগুলি নষ্ট কোত্তে হয় না, কাশীর পবনের প্রসাদে বংশ-রক্ষা হয়! কেহ কেহ জোড়া জোড়া আছে, কেহ কেহ ছাড়া ছাড়া! সামান্য একটা প্রবাদ আছে, কাশীপুরী পৃথিবী-ছাড়া; মহাদেবের ত্রিশুলের উপর কাশী। পৃথিবীর পাপ কাশী স্পর্শ করে না। এই প্রবাদে যাদের বিশ্বাস, পৃথিবীর সেই সকল পাপী কাশীধামে পালিয়ে এসে মনের সাধে নূতন নূতন পাপ করে। শাস্ত্রকথা তারা মনের কোণেও স্থান দেয় না। বেদব্যাসের শাপ আছে, অন্যস্থানে যে সকল পাপ অনুষ্ঠিত হয়, কাশীবাসী হোলে সে সকল পাপ ধ্বংস হয়ে যায়; কিন্তু কাশীতে যারা পাপ করে, তাদের পাপ অবিনাশী; মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত সে পাপের ক্ষয় হয় না; কাশীর পাপে অনন্তকাল নরকভোগ! ঋষিবাক্যানুসারে জ্ঞানের পাপ আর তীর্থের পাপ অক্ষয় হয়ে থাকে; তীর্থের পাপীরা এই সকল শাস্ত্রবাক্যে আদৌ ভ্রূক্ষেপ রাখে না, সাধুবাক্যে বধির হয়ে নিরন্তর নূতন পাপে রত হয়! অনেক দেখে শুনে এই কারণেই আমি বোলছি, কোথাকার পাপ কোথায়! [...]

নূতন বন্ধু;—কামরূপদর্শন

নৌকায় আরোহণ কোল্লেম। ভাগীরথী আপন মনে উত্তরমুখে ছুটেছেন, মহাবিপদে আমি নিপতিত, কাতর-হৃদয়ে আমার অবস্থার কথা তাঁরে আমি জানালেম। ভাগীরথীর দ্রব-হৃদয় আমার দুঃখে আর অধিক দ্রবীভূত হলো না, আমার কাতরবচনে দ্রবময়ী দেবী কিছুই উত্তর দিলেন না, আপন বেগে আপনিই নেচে নেচে আপন পথে চোলে যেতে লাগলেন। আমি এখন যাই কোথা? মাঝীকে বোলেছিলেম, প্রয়াগে যাব। নৌকায় বোসে বোসে ভাবলেম, প্রয়াগে হয় তো মোহনলালবাবু আছেন, সেখানে গেলে হয় তো আমি তাঁর চক্ষে পোড়বো, আবার একটা নূতন বিপদ উপস্থিত হবে। বাতাস তখন উত্তরদিকে ফিরেছিল; মলয়পর্ব্বতের বাতাস, সুখীজনের সুস্থ শরীরকে সুশীতল করে, আমার পক্ষে মলয়ানিল সুখপ্রদ বোধ হলো না; কেন না, আমি অসুখী। বাতাসের দয়া আছে। আমি অসুখী হোলেও পবন যেন আমার কানে কানে পরামর্শ দিলেন, "তুমি প্রয়াগতীর্থে যাও; যে লোকের ভয়ে তোমার মন বিচলিত হোচ্ছে, সে লোক এখন প্রয়াগে নাই, বাঙলাদেশে চোলে গিয়েছে।"

বাতাসের কথায় আমি ভরসা পেলেম; মনেও প্রত্যয় জন্মিল, ঐ কথাই ঠিক।

৩০৩ পৃষ্ঠার পর

অপঘাতে প্রাণদানের ভেতর দিয়ে। বাঙালি গৃহবধূ কিংবা বিধবা নারীর স্খলন এবং সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষের যৌন-কলঙ্কের কথাও গোপন রাখেনি হরিদাস।

হরিদাস মনেপ্রাণে ছিল রাজভক্ত—ইংরেজের অনুরাগী। কিন্তু তার স্বদেশিকতার কিছু পরিচয় মেলে সিপাহি বিদ্রোহ আর পলাশীর যুদ্ধের প্রসঙ্গে চকিত মন্তব্যে। উত্তরকালে রাইতের স্বদেশবাসী যখন পলাশীর প্রাঙ্গণে এসে ব্রিটিশ শক্তির বিজয়ের স্মরণে জয়ধ্বনি করে, তখন তাদের চীৎকারধ্বনি-শ্রবণে কাননের পাখীরা আতঙ্কে কলরব কোত্তে কোত্তে উড়ে উড়ে পালায়—এই কথার প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য গুরুত্বহীন নয়।

হরিদাসের গুপ্তকথায় সেকালের অনেক কৃতী পুরুষেরাই মজেছিলেন। লুকিয়ে-চুরিয়ে এর কাহিনির স্বাদ গ্রহণে তাঁরা কখনো বিমুখ হননি। সুকুমার সেন তা বলেছেন, এ ছিল 'গোপনে পড়বার বই' (*বটতলার ছাপা ও ছবি*, কলকাতা, ১৯৮৯)। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও 'কত রস' 'কত আনন্দ'র এ বই আবিষ্কার করেছিলেন তাঁদের 'পুরনো পল্লী-ভবনে'। তাঁর খোলামেলা স্বীকারোক্তি এ বিষয়ে এই রকম : '...বাবার ভাঙা দেরাজ থেকে খুঁজে বার করলাম "হরিদাসের গুপ্তকথা"। ...গুরুজনদের দোষ দিতে পারি নে, স্কুলের পাঠ্য ত নয়, ওগুলো বদ ছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই কোরে নিতে হলো আমাদের বাড়ির গোয়ালঘরে। সেখানে আমি পড়ি 'সঙ্গীরা শোনে' (*শরৎ রচনাবলী*, ৫ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৪)। 'নিষিদ্ধ ফল' ভক্ষণের আগ্রহ ছোকরা শরৎচন্দ্রের তো থাকতেই পারে, রসিক পিতা মতিলালেরও ছিল। হয়তো অজান্তেই পুত্রের জন্য সেই ফল ভক্ষণের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও নাকি এই 'গুপ্তকথা' সম্পর্কে 'কৌতূহল প্রকাশ' করেন। আর বহুকাল পরে নতুন করে এই বই পাঠকে হাপিত্যেশ দিয়ে হাল আমলের প্রকাশক মন্তব্য করেন, 'এই এস্থটি পড়বার পর ঠাকুমার যৌবনকালের আতর মেশানো পুরোনো বেনারসী শাড়ির গন্ধ পাই।'

এসব কথা বিবেচনা করে একালের পাঠকের সঙ্গে তাই *হরিদাসের গুপ্তকথার* পরিচয় করিয়ে দেওয়ার তাগিদ বোধ করি। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের অন্তরঙ্গ চালচিত্রের সন্ধান মিলবে এই বইয়ের পাতায়। কিন্তু ৬৪৪ পৃষ্ঠার ঢাউস বইয়ের সঙ্গে পুরোপুরি পরিচয় করানো তো সম্ভব নয়, তাই ভূমিকায় কিছু পরিচয় দিয়ে নির্বাচিত সামান্য কিছু অংশ পাঠককে উপহার দিলাম। সেকালের অকৃতী হরিদাস যে গুপ্তকথা সংকোচ-কুণ্ঠা ছাপিয়ে বলতে পেরেছিল, একালের প্রাজ্ঞ হরিদাসেরা তার থেকে হয়তো তাঁদের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত কিছু গুপ্তকথা প্রকাশের প্রেরণা পেলেও পেতে পারেন। প্রিয় পাঠক! আসুন, এবার আমরা *হরিদাসের গুপ্তকথার* আলো-আঁধারি অপরিসর অন্দরে প্রবেশ করি।

কাশীর বাইজীকে সহচরী কোরে মোহনলালবাবু স্বদেশেই ফিরে গিয়েছেন; যদিও নিজদেশে নিজবাড়ীতে না গিয়ে থাকেন, সহচরী-সঙ্গে সখের রাজধানী কলিকাতায় গিয়েছেন, এইটীই সম্ভব; প্রয়াগে নাই। তবে আমি প্রয়াগেই যাব। কর্ণধারকে পূর্ব্বে সেইরূপ উপদেশ দেওয়াই ছিল, যথাসময়ে প্রয়াগের ঘাটে নৌকা পৌছিল, আমি অবতীর্ণ হোলেম। [...]

পাঁচদিনের পর বাবু আমারে বোল্লেন, "অনেকগুলি তীর্থ আমি দর্শন কোরেছি, সম্প্রতি কামরূপদর্শনের অভিলাষ হয়েছে, কামাখ্যাদেবী সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আসাম প্রদেশে কামরূপতীর্থ সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা শুনা যায়; সেই তীর্থ দর্শনে শীঘ্রই আমি যাব। তুমি কি আমার সঙ্গে সেখানে যেতে ইচ্ছা কর? [...]" [...] বাবুকে আমি বোল্লেম, "নূতন নূতন তীর্থদর্শনে আমার বড় সাধ, আপনি যদি অনুগ্রহ কোরে সঙ্গে নিয়ে যান, আমি চরিতার্থ হব।" [...]

কামরূপে আমরা উপস্থিত হোলেম। আসামের একটী প্রধান নগর গৌহাটী। গৌহাটীর তিনমাইল দূরে কামরূপ। কামাখ্যাদেবী এখানে বিরাজিতা, এই কারণে কামরূপের দ্বিতীয় নাম কামাখ্যা। [...]

এখানকার সকলের মুখেই শুনা যায়, অন্যান্য দেশেও বলে, কামরূপ-কামাখ্যায় মায়াবিদ্যার বড়ই প্রাদুর্ভাব ছিল; কামাখ্যার ডাকিনীরা আশ্চর্য্য মায়াবিনী; মন্ত্রবলে তারা অন্যস্থানের স্থাবরপদার্থ কামাখ্যায় নিয়ে যেতে পাত্তো। গাছচালা ডাকিনী একটা প্রসিদ্ধ কথা। অন্যদেশের পুরুষ কামাখ্যায় এলে আর স্বদেশে ফিরে যেতে পাত্তো না; এখানকার মায়াবিনীরা সেই সকল পুরুষকে ভেড়া বানিয়ে রাখতো। ভেড়া বানিয়ে রাখা এ কথাটা তাৎপর্য্য বোধ হয়, জাদুমন্ত্রে ভুলিয়ে ভুলিয়ে বশীভূত কোরে রাখা। এখানকার লোকের মুখে আরো শুনা যায়, মায়াবিনীরা স্বেচ্ছাক্রমে পশুপক্ষীর রূপধারণ কোত্তে পাত্তো। এখনো পারে কি না, অপরাপর মায়ার খেলা এখনো চলে কি না, তার কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না; কিন্তু ঐ সকল কথা যে একেবারেই মিথ্যা, এমনও বোধ হয় না। কারণ, বঙ্গদেশের বাজীকরেরা,—ভানুমতীরূপিণী বেদিনীরা যেমন ভোজবাজীর দোহাই দিয়ে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করে, জাদুবিদ্যার প্রাদুর্ভাব কামাখ্যায় ছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না; যতটা গুজোব, ততটা সত্য নয়, এইরূপ অনুমান হয়। [...]

এখানে কুমারীর ভিড়। "বাবু একটা পয়সা, বাবা একটী পয়সা, মা একটী পয়সা," এই রকম প্রার্থনা। সহজপ্রার্থনাও নয়, টানাটানিও আছে। কুমারী কম নয়; আমরা দেখলেম, প্রায় অর্দ্ধ সহস্র। সকলকেই একটী একটী পয়সা দিয়ে আমরা বেরুলেম। যাত্রীরা পুণ্যকামনায় কুমারী-ভোজন করায়। কাশীতে দণ্ডী-ভোজনের যেরূপ ফল, কামাখ্যায় কুমারী-ভোজনেও সেইরূপ ফল, শুনা গেল। [...]

কামরূপের স্ত্রীলোকেরা মায়াজালে বিদেশী পুরুষগণকে বিমুগ্ধ কোরে রাখে, মায়ায় যারা বদ্ধ হয়, তারা আর দেশে ফিরে যায় না, যেতেও পায় না, এই কথাটা কতক পরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য। পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখন তেমন নাই, পাণ্ডারা এই কথা বলে। তারা আরো বলে, এখনো যে সকল বিদেশী পুরুষ একান্ত কামমোহিত, কামরূপের সুন্দরী সুন্দরী মেয়েমানুষ দেখে, লোভে পোড়ে তারাই বাঁধা পোড়ে যায়। [...]

[...] যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে আমি উত্তর কোল্লেম, "গল্প-কথা অনেক রকম হয়। ভেল্কীবাজী চক্ষে দেখা যায়, দেখে দেখে আশ্চর্য্যজ্ঞান হয়, কিন্তু কিছুই সত্য হয় না। কামরূপের স্ত্রীলোকেরা মায়াবিদ্যা জানে, এটা সত্য হোতে পারে, মায়ার কুহকে কামুক পুরুষগণকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে রাখা, এটাও সত্য হোতে পারে, কিন্তু দ্বিপদ মনুষ্যকে চতুষ্পদ মেষরূপে পরিণত করা কখনই সত্য হোতে পারে না। কোন কোন লোকের মুখে আমি শুনেছি, কামরূপে ব্যভিচার কিছু প্রবল, এখানে পতিব্রতা সতী কম; সধবাও ব্যভিচারে রত হয়, বিধবারাও ব্যভিচারে রত হয়। তীর্থযাত্রীদলের ভিতর সুপুরুষ দর্শন কোল্লে এখানকার দুশ্চারিণীরা সেই সকল পুরুষকে হস্তগত করবার চেষ্টা করে, সম্ভবতঃ এই কথাই সত্য; সত্য-ডাকিনী কিম্বা সত্যভেড়া অসম্ভব কথা। মানুষেরা পশু হয়, পাখী হয়, বৃক্ষ হয়, পশুরা মানুষের মত কথা কয়, এ সকল অলৌকিক ব্যাপারে আমার বিশ্বাস হয় না।"

গর্ভসঞ্চারের দাওয়াই দিচ্ছেন মোহান্ত, কালিঘাটের পট, ঊনিশ শতক

নূতন চাকরী

[...] আমি চাকরী করি। মুর্শিদাবাদ প্রাচীন সহর, অবকাশকালে প্রকৃতিদর্শনে আমি বহির্গত হই। ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে মুর্শিদাবাদ সহর, পশ্চিমকূলেও অনেকগুলি নগর ছিল, ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধিশূন্য হয়ে এসেছে। মুর্শিদাবাদের প্রাচীন নাম ছিল মুখশুধাবাদ, বঙ্গের নবাব মুর্শিদকুলী খান আপন নামে এই মুখশুধাবাদের নূতন নাম দেন মুর্শিদাবাদ। তদবধি সেই নামটীই চোলে আসছে।

পূর্ব্বেই বোলেছি, ভাগীরথীর উভয়কূলে মুর্শিদাবাদ। পূর্ব্বকূলে সহর, আদালতযুক্ত বহরমপুর, কাশীমবাজার, খাগড়া ইত্যাদি; পশ্চিমকূলে আজিমগঞ্জ, কানসোনা, কিরীটেশ্বরী ও রাঙামাটি

প্রভৃতি অনেক স্থান আছে। আমি গরিব, কিন্তু যেখানে যখন যাই, সেখানকার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দর্শন করবার ইচ্ছা বলবতী হয়ে থাকে। মুর্শিদাবাদে কিরীটেশ্বরী নামে এক দেবী আছেন। [...] ডাহাপাড়া গ্রামের দেড়ক্রোশ পশ্চিমে কিরীটেশ্বরী-পীঠ। [...] "কিরীটেশ্বরীর মেলা" নামে পৌষ-মাসে মহাসমারোহে একটী মেলা হতো, আজিও হয় [...]। মুর্শিদাবাদ যখন বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার রাজধানী হয়, মুসলমান-নবাবেরা সেই সময় কিরীটেশ্বরীর মহিমা স্বীকার কোত্তেন। কথিত আছে, মহারাজ নন্দকুমার যখন নবাবসরকারের দেওয়ান ছিলেন, সেই সময় নবাব মীরজাফর আপন জীবনের অন্তকালে মহারাজের অনুরোধে কিরীটেশ্বরী-দেবীর চরণামৃত পান কোরেছিলেন। [...]

লোকের মুখেও কতক কতক শুনলেম, চক্ষেও কতক কতক আমি দেখলেম। ভাগীরথীর উভয়তীরে মুর্শিদাবাদের যে যে স্থান দর্শনযোগ্য, কতিপয় বিশেষজ্ঞ লোকের সঙ্গে এক একদিন বেড়িয়ে বেড়িয়ে সেগুলিও আমি দর্শন কোল্লেম। পূর্ব্বতীরে নবাব নাজীমের বাড়ী, বাগান, চিত্রশালা, তোপখানা ইত্যাদি দিব্য সুন্দর; কাশীমবাজারের রাজবাড়ী খুব প্রশস্ত, কিন্তু প্রাচীন ধরনের। বহরমপুরের আদালতগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। খাগড়ার পিত্তল-কাঁসার জিনিস বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ। একে একে এই সব আমি দেখলেম। আমার চক্ষে সুন্দর বোধ হলো, কিন্তু এখানকার ভদ্রলোকেরা বলেন, মুর্শিদাবাদের পূর্ব্বশ্রী এখন কিছুই নাই। মুর্শিদাবাদ যখন বাঙলার রাজধানী ছিল, তখন এ স্থানের শোভাসমৃদ্ধির সীমা ছিল না। চীন-পরিব্রাজক হিউয়েনশিয়াং ভারতভ্রমণ সময়ে মুর্শিদাবাদে এসেছিল, সেই দূরদর্শী ভ্রমণকারীর লিখিত বিবরণীতে মুর্শিদাবাদের উচ্চপ্রশংসা পরিকীর্ত্তিত আছে, এ কথাও আমি এখানে পণ্ডিতলোকের মুখে শ্রবণ কোল্লেম। [...]

নূতন তীর্থ

বহরমপুরের আদালতে মোকদ্দমা। কতদিনে সে মোকদ্দমা শেষ হবে, কতদিনে অমরকুমারীকে পাওয়া যাবে, কতদিনে আমি আবার অমরকুমারীর দর্শন পাবো, দর্শনের আশা কতদিনে আমারে শান্তি দান কোরবে, সমস্তই ভবিষ্যতের গর্ভগত। নিষ্কর্ম্মা হয়ে বহরমপুরে বোসে থাকা আমি আর উচিত বিবেচনা কোল্লেম না, এক সপ্তাহ পরেই বাবুদের বাড়ীতে ফিরে এলেম।

পৌষমাসের শেষ। যে দিন আমি এলেম, তার পরদিন দীনবন্ধুবাবু আমাকে বোল্লেন, "ইংরেজী আদালতের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হোতে অনেক বিলম্ব হয়। আমি একবার দ্বারকাতীর্থে যাত্রা করবার অভিলাষ কোরেছি, তুমি দেশভ্রমণ ভালবাস, যাবে কি আমার সঙ্গে?" [...]

পৌষমাসের ৭ দিন বাকী; মাঘমাসের ১০ই ১২ই যাত্রা করবার কথা; প্রায় কুড়ি দিন মুর্শিদাবাদে আমার থাকা হবে। মুর্শিদাবাদের একটী প্রসিদ্ধ স্থান পলাশী-ক্ষেত্র। এই অবকাশে পলাশীক্ষেত্রটি আমি একবার দর্শন কোরে আসবো, এই আমার নূতন সঙ্কল্প। [...]

মুর্শিদাবাদ সহরের ১৫ ক্রোশ দক্ষিণে পলাশী-প্রান্তর। নিকটে পলাশীগ্রাম। সেই গ্রামের নামেই প্রান্তরের নামকরণ। প্রবাদ এইরূপ যে, পূর্ব্বে এই স্থানে বিস্তর পলাশবৃক্ষ ছিল, সেই সকল বৃক্ষের নামেই স্থানের নাম পলাশী। প্রান্তরের পশ্চিমপার্শ্বে ভাগীরথী। মুর্শিদাবাদ থেকে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত যে একটী রাস্তা আছে, সেই রাস্তা ঐ প্রান্তরের মধ্য দিয়া চোলে গিয়েছে।

পলাশীপ্রান্তর দীর্ঘে দুই ক্রোশ, প্রস্থে এক ক্রোশ, এইরূপ সীমা ছিল, এখন স্থানে নূতন নূতন গ্রাম বোসেছে, কতক স্থান ভাগীরথীগর্ভে প্রবেশ কোরেছে, সুতরাং প্রান্তরের পূর্ব্ববিস্তৃতি অনেকটা কম হয়ে এসেছে। যে যে অংশ ভাগীরথী-গর্ভে প্রবিষ্ট, সেই সেই অংশের এক এক স্থানে অধুনা এক একটা চর দেখা যায়; বর্ষাকালে সেই সকল চর-ভূমি জলমগ্ন হয়, ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বায়ু-হিল্লোলে তরঙ্গ খেলায়।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে এই পলাশীক্ষেত্রে বঙ্গের রাজলক্ষ্মী ব্রিটিশপ্রতাপের অঙ্কশায়িনী হন। নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজ-সৈন্যের যুদ্ধ। বঙ্গের ইতিহাসে এই যুদ্ধই পলাশীযুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। ছোটবাবুর সঙ্গে যে সকল লোক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা বয়ঃপ্রবীণ এবং ইতিহাস-তত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাঁদের মুখে শুনলেম ইংরেজরা যতই গৌরব করুন, পলাশী-যুদ্ধ বাস্তবিক ন্যায়যুদ্ধ অথবা মহাযুদ্ধ নামে কদাচ গণ্য হোতে পারে না; ফাঁকা আওয়াজে বিজয়ঘোষণা।

মীর জাফর প্রভৃতি মন্ত্রিগণের বিশ্বাসঘাতকতাই ইংরেজ-বিজয়ের প্রধান হেতু। ইতিহাসে আছে, পলাশীর আম্রকাননে জগৎশেঠ প্রভৃতির পরামর্শ হয়েছিল, আম্রকাননে কর্ণেল ক্লাইব শিবির স্থান কোরেছিলেন, আম্রকাননের শীকারমঞ্চে দণ্ডায়মান থেকে নবাব-সৈন্যের বিক্রম-দর্শনে ক্লাইব প্রথমে ভয় পেয়েছিলেন, সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত হোতে আদেশ দিয়েছিলেন। পরিশেষে ভাগ্যবলে ক্লাইবের পক্ষে জয়লাভ, গুপ্তহন্তার হস্তে সিরাজদ্দৌলার মৃত্যু, মুসলমানের বলক্ষয়, ইংরেজের বঙ্গাধিকার। পলাশী-বিজয়ের অগ্রে জাহাজের কেরাণী ক্লাইব কর্ণেল ক্লাইব হয়েছিলেন, পলাশী-বিজয়ের পর কর্ণেল ক্লাইব বারণ ক্লাইব হন। সেই ক্লাইব আমাদের ইতিহাসে লর্ড ক্লাইব। [...]

পলাশীক্ষেত্রে যা কিছু দেখা গেল, তদপেক্ষা অধিক কথা শুনা গেল। [...] পথে আসতে আসতে আমাদের সঙ্গীগণের মধ্যে একজন ইংরেজীনবীস ভদ্রলোক বোল্লেন, "বিলাতে সাহেব-বিবিরা এ পথে যখন আসে, জলপথেই আসুক আর স্থলপথেই আসুক, পলাশীপ্রান্তরে উত্তীর্ণ হয়, পলাশীকে তারা তীর্থস্থান বলে, পলাশীতীর্থে পদার্পণ কোরে উচ্চকণ্ঠে তারা জয়ধ্বনি করে; তাদের চীৎকারধ্বনি-শ্রবণে কাননের পাখীরা আতঙ্কে কলরব কোত্তে কোত্তে উড়ে উড়ে পালায়।" এ পরিচয় শ্রবণে আমি হাস্য কোল্লেম।

আমরা বাড়ী এলেম। পূর্ব্বেই বোলেছি, পৌষমাস সমাপ্তপ্রায়। নিত্য নিত্য আমি বহরমপুরে যাই, মোকদ্দমা কোন দিন কতটুকু অগ্রসর, সংবাদ রাখি, রজনীবাবুকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করি, যেগুলি তাঁর জানা দরকার, পূর্ব্বে যা আমি বলি নাই, সেগুলি জানিয়ে জানিয়ে দিই, এক একরাত্রি তাঁর বাসাতেও আমি থাকি, এই রকমে দিন যায়। [...]

৫ই মাঘ সমাগত। বড়বাবুর যেমন অভ্যাস, তদনুসারে বিনা আড়ম্বরে তিনি প্রস্তুত হোলেন, একজনের পরিবর্ত্তে দু-জন চাকর আর একজন পাচক-ব্রাহ্মণ সঙ্গে থাকলো, দুর্গানাম স্মরণ কোরে আমরা যাত্রা কোল্লেম। দ্বারে মঙ্গলঘট, কদলীতরু, আম্রশাখা; সেইগুলিকে প্রণাম কোরে উপযুক্ত যানারোহণে আমরা তীর্থভ্রমণে চোল্লেম। সে সময় এ দেশে কলের গাড়ী ছিল না, ভিন্ন ভিন্ন যানে যত সময়ে গুজরাটে উপস্থিত হওয়া যায়, ততদিনে আমরা গুজরাটে গিয়ে পৌছিলেম।

প্রথমে আহমদনগর। নগরটি দিব্য পরিপাটি, দেবালয়ও অনেকগুলি, তন্মধ্যে ভদ্রকালী প্রধান। আমরা ভদ্রকালী দর্শন কোল্লেম, পূজা দিলেম, তিন রাত্রি সেখানে বাস কোরে দ্বারকায় উপনীত হোলেম। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ছিল, চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে, মন্দিরে বিগ্রহ আছেন, বিগ্রহগুলি আমরা দর্শন কোল্লেম, শরীর পুলকিত হলো। লোকের মুখে শুনলেম, দ্বারকার পূর্ব্ব-শ্রী এক্ষণে কিছুই নাই।

ব্যাধবীর কালকেতু মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় গুজরাটের বন কেটে নগর পত্তন কোরেছিলেন, সেই গুজরাট এখন আর একপ্রকার শ্রীসম্পন্ন। সৌরাষ্ট্র প্রদেশ পরিভ্রমণ কোরে আমরা বরদারাজ্যে উপনীত হোলেম। বরদা হিন্দুরাজত্ব। বরদার মহারাজ স্বাধীন। তিনি স্বয়ং সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁর নিজের ব্যবস্থানুসারে রাজ্য শাসিত হয়, প্রজাপুঞ্জ সুখে বাস করে। বরদায় ভবানীদেবীর একটি মন্দির আছে। ভবানী-মন্দিরে সাময়িক উৎসব হয়, নূতন প্রণালীতে নৃত্যগীত হয়, কুলকামিনীরাও উজ্জ্বল বেশভূষা পরিধান কোরে নৃত্যগীত করেন, দর্শনে শ্রবণে মনের প্রীতি জন্মে। যে সময় আমরা গিয়েছিলেম, সে সময় একটি উৎসব ছিল, উৎসবস্থলে মহারাজ উপস্থিত ছিলেন, দেবীদর্শন উপলক্ষে মহারাজকেও আমরা দর্শন কোল্লেম। সপ্তাহকাল বেশ আমোদ-আহ্লাদে অতিবাহিত হলো। [...]

বঙ্গে প্রত্যাগমন

পথে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হলো না, যথাযোগ্য যানবাহনে আমরা যথাসময়ে মুর্শিদাবাদ উপস্থিত হোলেম। [...] দীনবন্ধুবাবুর প্রত্যাগমনে সকলেই সুখী হোলেন, সকলের মনের উদ্বেগ দূর হলো; আমারে যাঁরা যাঁরা ভালবেসেছিলেন, আমারে দেখে তাঁরাও তুষ্ট হোলেন।

দেশভ্রমণের পরিচয় দিবার ভূমিকা আনয়নের অগ্রে পশুপতিবাবুকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমার মোকদ্দমা

কতদূর? অমরকুমারীর সন্ধান হয়েছে কি না?" [...]

আমারে নিতান্ত অস্থির দেখে ছোটবাবু বোল্লেন, "শুনেছি না কি অমরকুমারীর সন্ধান হয়েছে, কিন্তু তাঁরে এখনো উদ্ধার করা হয় নাই। অমরকুমারী কোথায় আছেন, সেই সন্ধানটি জানা হয়েছে, যারা তাঁরে সেইখানে রেখে দিয়েছে, তারা উপস্থিত না হোলে নূতন আশ্রয়ের অধিকারীরা অমরকুমারীকে ছেড়ে দিতে চায় না, এই পর্যন্ত আমি শুনেছি।" [...]

রক্তদন্তের সন্ধান হয় নাই। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে, পরোয়ানাতে হুলিয়া লেখা আছে, পুলিশের লোকেরাও স্থানে স্থানে সন্ধানে ফিরছে, গ্রেপ্তার করবার সুবিধা হোচ্ছে না। নফর ঘোষাল পূর্ব্বে বোলেছিল, জটাধর গুজরাটে; জেরার মুখে অনেক তর্কবিতর্কের পর শেষকালে বোলেছে কলিকাতায়। জেরার মুখে কুঞ্জবিহারীও খেলাপ। কুঞ্জবিহারী প্রথমেই বোলেছিল কলিকাতা, জেরায় বোলেছে ঢাকা। ঢাকার পুলিশে পরোয়ানা গিয়েছে, ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট দস্তখৎ কোরেছেন, ঢাকার পুলিশ সেই আসামীটাকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়েছে, সমস্ত যত্ন বিফল। রক্তদন্ত ঢাকায় নাই। সম্ভবতঃ অমরকুমারীর ঢাকায় থাকা সত্য হোতে পারে, কিন্তু ঢাকা একটি ক্ষুদ্রস্থান নয়, মুখের কথায় ঢাকা বোল্লেই অত বড় একটা জেলার ভিতর একটা লোককে খুঁজে বাহির করা সহজসাধ্য হয় না। নগরে কি উপনগরে, মহকুমায় কি পল্লীগ্রামে, তার একটা নিশ্চিত ঠিকানা চাই। [...]

[...] আমার কণ্ঠস্বরের কম্পন অনুভব কোরে হরিহরবাবু বেশ বুঝতে পাল্লেন, যথার্থই অমরকুমারীর জন্য আমার প্রাণ কাঁদে। তিনিও বুঝতে পাল্লেন, আমিও সেই সময় উত্তেজিত-স্বরে বোলে উঠলেম, "অমরকুমারীর অন্বেষণে আমি মাণিকগঞ্জে যাব।" [...]

রক্ষিতা, উনিশ শতক

আমি মাণিকগঞ্জে যাব, মাণিকগঞ্জে আমি অমরকুমারীকে দেখতে পাব, অমরকুমারীকে আমি উদ্ধার কোরে আনবো, আমার অন্তর-সাগরে এই সকল উল্লাস-তরঙ্গের ঘন ঘন ক্রীড়া। কি আছে আমার মনে, কি কারণে আমার উল্লাস, কি সব কথা আমি শুনেছি, জনপ্রাণীর কাছেও তখন সে সব কথা আমি প্রকাশ কোল্লেম না; আপনার আনন্দে আপনিই আমি বিভোর হয়ে থাকলেম। [...]

কুমারী-অন্বেষণ

আমি মাণিকগঞ্জে যাব। হেতু কি, দীনবন্ধুবাবুকে আর পশুপতিবাবুকে সেটি জানালেম; নিশ্চয় অমরকুমারীকে সেখানে পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে তাঁদের প্রতীতি জন্মিল না, তথাপি অন্বেষণ করা কর্তব্য, এই বিবেচনায় তাঁরা আমারে অনুমতি দিলেন। মণিভূষণকে সংবাদ দেওয়া গেল, মণিভূষণ এলেন; তাঁরে সঙ্গে কোরে একবার আমি বহরমপুরের আদালতে গেলেম। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত করা হলো যে, অপহৃতা অমরকুমারীর কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, ঢাকা জেলার এলাকায় অমরকুমারী আছেন, কোন বিশ্বস্তসূত্রে এই সংবাদটি শুনা হয়েছে, সন্ধানের জন্য আমি ঢাকায় চোল্লেম, সন্ধান যদি ঠিক হয়, ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে ঢাকার পুলিশ তদ্বিষয়ে আমার সহায়তা করেন, এইরূপ হুকুম প্রার্থনা। [...]

একমাস পূর্ণ হোতে যায়, কোন সন্ধান পাওয়া গেল না; এক প্রকার নিরাশ হয়ে মনে আমি স্থির কোল্লেম, অমরকুমারী মাণিকগঞ্জে নাই। বৃথা শ্রম, বৃথা কষ্ট, বৃথা ব্যয়, বৃথা একজন ভদ্রলোকের গলগ্রহ হওয়া, বৃথা কতকগুলি অচেনা লোকের কাছে উপহাসাস্পদ হওয়া। সন্ধান পাওয়া গেল না ভেবে মুর্শিদাবাদে যদি ফিরে যাই, সেখানে গিয়েও যদি ঐরূপ ভাবি, তাতেই বা কি হবে? [...]

প্রতিজ্ঞা;—প্রতিজ্ঞা-পালনে আমি সর্ব্বদাই তৎপর। মাণিকগঞ্জের লোকেরা যে স্থানটিকে মাণিকগঞ্জ বলে, যে পর্যন্ত মাণিকগঞ্জ সীমা দেয়, অনন্যমনে পরিক্রমণ কোত্তে কোত্তে পূর্ব্বদিকের সেই সীমা আমি অতিক্রম কোল্লেম; চোলেছি,—আপন মনেই চোলেছি;—পথের লোকেরাও চোলেছে; [...] ঘর-বাড়ী দেখছি, বৃক্ষলতা দেখছি, ছোট বড় উদ্যান দেখছি, ছোট বড় সরোবর দেখছি, রকমারি মনুষ্য দর্শন কোচ্ছি, গুরু, বাছুর, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি নানাপ্রকার জীবজন্তুও দর্শন কোচ্চি, মনে কোন প্রকার নূতন ভাবে উদয় হোচ্ছে না। অনেকদূর গিয়ে একটি লোককে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ গ্রামের নাম কি?" লোক উত্তর কোল্লে, "মাণিকগঞ্জ।" তখন আমি মনে কোল্লেম, এই বটে সেই কথা। মানসিক ভূগোলের মানসিক মানচিত্র। এই বটে সেই কথা। [...]

দ্বিতীয় প্রভাবে স্থানের দক্ষিণসীমায় পরিভ্রমণ। পূর্ব্বদিনের যে ভাব, এ দিনেও সেইরূপ। তৃতীয় দিবসে পশ্চিমসীমা, চতুর্থ দিবসে উত্তরসীমা উলঙ্ঘন। ডাকের কথায় যতদূর যাই, ততদূর মাণিকগঞ্জ। মানসিক ভূগোলের মানসিক মানচিত্র।

চণ্ডেশ্বর

আমি চোলেছি;—কি সন্ধান কোরে এলেম, লক্ষ্য বস্তু পেলেম কি না, ভাবতে ভাবতে চোলেছি। অমরকুমারীর নাম এখনো ব্রজকিশোরী। আমার মুখে অবগুণ্ঠন না থাকলে ব্রজকিশোরী আমারে চিনতেন; অবগুণ্ঠন রেখে আমি এক প্রকার ভালই কোরেছিলেম; আমার চেনাই দরকার ছিল,

আমারে সেখানে চেনা অমরকুমারীর পক্ষে এখন ততটা দরকার ছিল না। যদি আমি প্রকাশ হোতেম, খোলা মুখে যদি অমরকুমারীর সঙ্গে আমার কথাবার্তা চোলতো, তা হোলে রাতারাতি অমরকুমারীকে আমি উদ্ধার কোরে আনতে পাত্তেম। অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকবার অগ্রে সেইটি একবার আমি ভেবেছিলেম; সে ভাবে উদয় হবামাত্রই পরিণামবিবেচনার নূতন উপদেশ আমি প্রাপ্ত হই; সেই উপদেশেই সতর্কতা আসে, সেই সতর্কতায় অবগুণ্ঠনে মুখাবরণ। [...]

আমার হাতের উপর মণিভূষণের হাত, আমার চক্ষের দিকে মণিভূষণের চক্ষু, নির্নিমেষচক্ষে আমার চক্ষু নিরীক্ষণ কোরে, মণিভূষণ মুহূর্ত্তকাল নীরব হয়ে থাকলেন; কি তিনি বুঝলেন, কি তিনি বোলবেন, তৎক্ষণাৎ সেটি আমি অনুমান কোত্তে অক্ষম হোলেম না। একটু পরেই মণিভূষণ আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সন্ধান কিছু পেয়েছ কি?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "হাতের বস্তু যতক্ষণ হাতে না আসে, সন্ধান হয়েছে বোলে ততক্ষণ শ্লাঘা প্রকাশ করা উচিত হয় না। তুমি ঢাকায় চল, সন্ধানের ফলাফল—আশার ফলাফল—আমাদের পরিশ্রমের ফলাফল ঢাকা সহরেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে;—ফলের পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে;—ফলের পূর্ণতার নাম পরিপক্কতা;—তুমি ঢাকায় চল; বাঙ্গালায় একটা কথা আছে, "বেড়াল কাঁধে কোরে শীকার করা"—আমারে কাঁধে কোরে শীকার করবার অনুমতিলাভের জন্য তুমি ঢাকায় চল। [...]

হরিহরবাবুর বদন প্রফুল্ল, ধীরে ধীরে আমার পৃষ্ঠদেশে করার্পণ কোরে প্রফুল্লবদনে তিনি বোল্লেন, "বাহাদুর তুমি! এত অল্পবয়সে এতদূর কার্য্যপটুতা তুমি অভ্যাস কোরেছ, আশ্চর্যের কথা বটে! ঈশ্বর তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। দেখো, ঢাকায় যাচ্ছ, সাবধান;—সাবধানে সাবধানে সকল কাজ কোরো। ঠোকো না!"

নতমস্তকে আমি নমস্কার কোল্লেম। আমাদের ঢাকা-যাত্রার বন্দোবস্ত কোরে দিয়ে, শেষকালে হরিহরবাবু বোল্লেন, "ঢাকা-কোর্টের অনেকগুলি উকীলের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, তাঁদের মধ্যে একজনের নাম শিবশঙ্কর মল্লিক; তিনি বিদ্বান, বহুদর্শী, বিশেষরূপ আইনজ্ঞ; আমার নাম কোরে তাঁরে তুমি বোলো, মোকদ্দমার বিবরণ ভাল কোরে বুঝিয়ে দিও, শীঘ্র শীঘ্র সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হবে।" [...]

বুড়ীগঙ্গার উপরে ঢাকা সহর। পূর্ব্বে আমি আর কখনো ঢাকায় যাই নাই, ঢাকা আমি নূতন দেখলেম। বুড়ীগঙ্গার পূর্ব্বতীরে সহর, পশ্চিমতীরে প্রসিদ্ধ মিয়া সাহেবের সুন্দর অট্টালিকা, গঙ্গাবক্ষ থেকে সেই অট্টালিকার সুদৃশ্য সুপ্রশস্ত সোপানাবলী দৃষ্ট হয়। উত্তম শোভা। নগরের শোভা দর্শন করা আমার তখনকার কার্য্য ছিল না, নগরে উপস্থিত হয়েই অগ্রে আমরা আদালতে উপস্থিত হোলেম। বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাস ভঙ্গ হবার পূর্ব্বেই দরখাস্ত করা চাই, শিবশঙ্কর মল্লিকের অন্বেষণ কোল্লেম; ফৌজদারী কোর্টে তখন তিনি ছিলেন না, দেওয়ানী কোর্টেই সাক্ষাৎ কোল্লেম, মাণিকগঞ্জের হরিহরবাবুর নাম কোরে আমার বক্তব্যগুলি সংক্ষেপে তারে বোল্লেম; হরিহরবাবু বলেন নাই, আপন ইচ্ছায় আমি শিববাবুকে ষোলটি টাকা ফী দিলেম, তিনি উদ্‌যোগী হয়ে তৎক্ষণাৎ দরখাস্তের মুসাবিদা কোরে দিলেন, এক টাকা তহরী নিয়ে তাঁর মুহুরি শীঘ্র শীঘ্র সেই দরখাস্তখানি পরিষ্কার কোরে নকল কোল্লেন, মণিভূষণ সেই দরখাস্তে আপন নাম দস্তখৎ কোরে দিলেন, উকীলের দ্বারা দরখাস্ত দাখিল হলো। বহরমপুরের আদালতের কথাও সেই দরখাস্তে লেখা ছিল, দরখাস্তের সঙ্গে বহরমপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রেরিত রুবকারিখানি পেস হলো, উকীলের সঙ্গে ইতিমধ্যে সেরেস্তাদার পেস্কারের গুপ্তবন্দোবস্ত হয়েছিল, তাঁদের সহায়তায় সেইদিনেই হাকিমের হুকুমমত পুলিশের নামে পরোয়ানা বাহির হয়ে গেল। এজলাস ভঙ্গ হয় হয়, এমন সময় শিবঙ্করবাবুকে আমি চুপি চুপি বোল্লেম, "কেবল পুলিশের দ্বারা সে কার্য সুসিদ্ধ হওয়া সন্দেহস্থল, মেয়েটিকে উদ্ধার করবার সময় একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সেইখানে উপস্থিত থাকলে ভাল হয়।" মুখে মুখে সেই কথাটি হাকিমকে জানিয়ে শিবশঙ্করবাবু সেরেস্তাদারের মুখের দিকে চাইলেন, হাকিমও সেই প্রার্থনা মঞ্জুর কোল্লেন, [...] আমার উদ্বেগ দূর হয়ে গেল।

সন্ধ্যা হলো। রাত্রিকালে কোথায় থাকি? নৌকায় বাস করা সুবিধাজনক বোধ হলো না; বিশেষতঃ লোকের মুখে শুনলেম, বুড়ীগঙ্গার উত্তরাংশে ডাকাতের ভয় আছে, রাত্রিকালে তারা সময়ে সময়ে নৌকা মারে, নৌকায় বাস করা সুবিধাজনক বোধ হলো না, শিবশঙ্করবাবুর বাসাতেই রাত্রিবাস করা গেল।

পুলিশের দারোগা যাবেন, জমাদার যাবেন, বরকন্দাজ যাবে, সকলের উপর একজন ডেপুটিবাবু। একজন উকীল সঙ্গে থাকলে ভাল হয়, আমার মনে এই ভাবের উদয় হলো; শিবশঙ্করবাবুকে সেই কথা আমি বোল্লেম; যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা কোরে সহানুভূতিপ্রাপ্ত নিম্নশ্রেণীর একজন উকীলকে তিনি আমাদের সঙ্গে দিলেন, আমরা মাণিকগঞ্জে যাত্রা কোল্লেম। [...] অল্পসময়ে আমরা মাণিকগঞ্জে পৌছিলেম। [...] অনেক বিবেচনা কোরে রমণীবাবুকে আমি বোল্লেম, "আপনার বাড়ীর সেই দাসীটি, [...] রেবতীকে আমাদের সঙ্গে যেতে বলুন; অমরকুমারীকে রেবতী ভালবাসে, বিদেশিনী ব্রজকিশোরী এখন অমরকুমারী হয়েছেন, [...] অমরকুমারীর সঙ্গে রেবতী থাকলেই ঠিক হবে।" [...]

আমরা ঢাকায় চোল্লেম। [...] বহু শ্রম, বহু আয়াস, বহু বাদানুবাদ, বহু চিন্তা আর বহুতর নীরস বিষয়ের আলোচনার পর মানুষের মনে স্বভাবতই একটু আমোদ-কৌতুকের ভাব উদয় হয়। নূতন উৎসাহে জলপথে তরণী-আরোহণযাত্রা; বারিসিক্ত সুশীতল সমীরণ-সেবনে চিত্ত প্রফুল্ল; অনেকদিন অদর্শনের পর অমরকুমারীর দর্শনলাভ; এই সকল সুখসংযোগে আমার মনে একটু আমোদ-কৌতুকের ভাবোদয়। মৃদু বাতাসে হেলে দুলে তরণী চোলেছে; দাঁড়ী-মাঝীরা অভ্যাসমত জাতীয়সুরে জংলা রাগিণীতে গান ধোরেছে; আমরা অনেক দূরে এসে পোড়েছি। [...] অমরকুমারীর সঙ্গে সত্য কি আমার একটিও কথা হয় নাই?—হয়েছিল, কথা কিন্তু ওষ্ঠরসনায় নয়, চক্ষে চক্ষে। রেবতীর সঙ্গেও সেই রকম চক্ষে চক্ষে কথা। [...]

ঢাকা সহরের সদরঘাটে আমাদের তরণী পৌছিল। রাত্রিকাল। সঙ্গে স্ত্রীলোক, কোথায় যাওয়া যায়? বেশীক্ষণ চিন্তা কোত্তে হলো না। ডেপুটি বাবু ব্রাহ্মণ। আমাদের প্রতি তাঁর যত্নও যথেষ্ট। রাত্রিকালে তাঁর বাড়িতেই আমরা উঠলেম। বিনা কষ্টে নিরুদ্বেগে সেই বাড়ীতেই আমরা রাত্রিযাপন কোল্লেম। আমি মনে কোরেছিলেম, হয় তো অমরকুমারীকে নিয়ে আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে উপস্থিত হোতে হবে, সেখানে হয় তো শাখাপল্লব-সম্বলিত আসল মোকদ্দমার আসল বিবরণ এজাহার কোত্তে হবে, কিন্তু ডেপুটিবাবুর অনুগ্রহে সে কষ্টটা আমাদের স্বীকার কোত্তে হলো না; ডেপুটিবাবু নিজেই উপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট দিলেন, অপহৃতা কন্যাকে উদ্ধার করা হয়েছে; কন্যা মুর্শিদাবাদে যে বাড়ীতে ছিল, সেই বাড়ীর অধিকারীর উপযুক্ত পুত্র মণিভূষণ দত্ত, সেই মণিভূষণের হস্তে কন্যাটিকে সমর্পণ করা হয়েছে, এই মর্ম্মে রিপোর্ট। সে রিপোর্টে আরো লেখা ছিল, মূল আসামী নিরুদ্দেশ; সম্ভবতঃ যোগের আসামী রমণীবল্লভ ভৌমিক, ধনঞ্জয় ঘটক, আর বংশীধর পোদ্দার, এই তিনজনকে আদালতে উপস্থিত করা হয়েছে।

আমাদের আর আদালতে যেতে হলো না, ডেপুটিবাবুর বাড়ীতেই এক দিন এক রাত্রি আমরা বাস কোল্লেম। রাত্রিকালে ডেপুটিবাবু আমারে নিগূহে আহ্বান কোরে বোল্লেন, "অমরকুমারীকে নিয়ে তোমরা দেশে যাও, এখানকার পুলিশের একজন প্রহরী তোমাদের নিরাপদের জন্য সঙ্গে থাকবে; চণ্ডেশ্বর গণেশ্বর আর মিয়াজান, এই তিনজনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়াণা জারি হোচ্ছে; তারা গ্রেপ্তার হয়ে এলে মুর্শিদাবাদে চালান হবে; মূল মোকদ্দমা মুর্শিদাবাদে; শাখা-মোকদ্দমার বিচার এখানে হবে না। রমণীবল্লভ, ধনঞ্জয়, আর বংশী পোদ্দার এই তিনজনের হাজার টাকা তাইনে মুফলকা নিয়ে আপাততঃ তাদের খালাস দেওয়া হলো। তারা যদি মূল আসামীদের হাজির কোত্তে পারে, যোগাযোগ যদি প্রমাণ না হয়, তবে তারা আসামী-শ্রেণীভুক্ত হবে না। মোকদ্দমা বিচারের সময় তাদের কিন্তু একবার মুর্শিদাবাদে যাওয়া আবশ্যক হবে। তোমরা এখন দেশে যাও।"

সে রাত্রের এই পর্য্যন্ত কথা। পরদিন প্রভাবে আমরা মাণিকগঞ্জে যাত্রা কোল্লেম। রেবতী তখন আমাদের তরণীতে থাকলো না। বাবুদের নৌকাতেই তারে যেতে

হলো। বাবুদের নৌকায় রমণীবাবু, ধনঞ্জয় আর বংশীধর, সেই নৌকায় রেবতী। [...]

পদ্মায় প্রাণ যায়

যে বজরায় ঢাকায় আসা হয়েছিল, সেই বজরায় আরোহণ কোরে আমরা মাণিকগঞ্জে চোল্লেম। আমরা ছয় জন;—আমি, মণিভূষণ, অমরকুমারী, হরিহরবাবুর সরকার, হরিহরবাবুর চাপরাসী আর ঢাকার পুলিশ প্রহরী। [...]

মাণিকগঞ্জে তরণী পৌঁছিল। হরিহরবাবুর বাসায় আমরা উত্তীর্ণ হোলেম। বাসায় পরিবার থাকেন না, কিন্তু বাসাবাড়ী দু-মহল। ভিতরমহলে অমরকুমারীকে রাখা হলো, বাসায় দাসী আর পাচিকা অমরকুমারীর সঙ্গিনী হয়ে থাকলো। হরিহরবাবু অমরকুমারীর রূপ দর্শন কোল্লেন; যত কষ্টে, যত কৌশলে, যত ব্যয়ে, যত শ্রমে অমরকুমারীকে আমি উদ্ধার কোরেছি, আমার মুখে সেই সব কথা শ্রবণ কোল্লেন; তত অল্প বয়সে তত সৃষ্টি আমি কোরেছি, স্নেহবশে প্রশংসা কোরে আমারে সাধুবাদ দিলেন; ভক্তিভাবে আমি তাঁরে অভিবাদন কোল্লেম।

মাণিকগঞ্জে তিন দিন। [...] তৃতীয় দিবসের রজনীযোগে হরিহরবাবুকে [...] আমি বোল্লেম; আর কালবিলম্ব না কোরে মুর্শিদাবাদে ফিরে যাওয়া আমার ইচ্ছা; এই নির্ব্বন্ধ জানালেম। একটু চিন্তা কোরে তিনি বোল্লেন, "আর একটি দিন অপেক্ষা কর। মণিভূষণ আর তুমি, দু-জনেই ছেলেমানুষ, অমরকুমারীও বালিকা; যেতে হবে অনেকদূর, ভয়ঙ্করী পদ্মানদী, পদ্মার তরঙ্গে বড় বড় সাহসী পুরুষেরও হৃদয় কম্পিত হয়; উপযুক্ত বন্দোবস্ত কোরে, উপযুক্ত লোকজন সঙ্গে দিয়ে, একদিন পরে আমি তোমাকে পাঠাব; আর একটি দিন মাত্র অপেক্ষা কর।" [...]

পরদিন মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে আহারাদি কোরে আমরা নৌকারোহণ কোল্লেম, আমাদের জন্য বড় একখানি বজরা, আর রন্ধনের জন্য আর একখানি নৌকা ভাড়া করা হলো, বজরা আমাদের পদ্মানদীতে প্রবেশ কোল্লে, আমরা পদ্মাগর্ভে ভাসলেম। পূর্ণ বর্ষাকাল নয় তথাপি পদ্মার এ কূল ও কূল দেখা যায় না। অল্পবাতাসেও পদ্মানদীতে তুফান হয়, তরঙ্গে তরণীগুলি যেন নৃত্য কোত্তে থাকে। আমরা যে দিন পদ্মায় সে দিন অল্প অল্প হাওয়া ছিল, তরঙ্গ প্রবল ছিল, বাতাসের গতি উত্তরদিকে, পদ্মা একটানা, দক্ষিণবাহিনী, উজানে তরণী চোলেছে, যে দিকে স্রোত, বায়ু সে দিকে অনুকূলে ছিল না, কাজে দ্রুতগমনে বাধা হোচ্ছিল, এক ঘণ্টার পথে দুই ঘণ্টা অতীত। [...] পশ্চাতে আমি চেয়ে দেখলেম, একখানিও নৌকা দেখা গেল না, দূরে দূরে ক্ষুদ্রাবয়ব এক একখানি নৌকার পালদণ্ড দেখা গেল, কিন্তু সে সকল নৌকারও গতি অন্যদিকে। এক এক জায়গায় ইলিশমাছ ধরার ডিঙ্গী; জেলেরা স্ফূর্ত্তিতে গান কোত্তে কোত্তে মাছ ধোরে বেড়াচ্ছে, এক এক ক্ষেপে বহু মৎস্য আটক পোড়ছে, দেখতেই এক তামাসা। [...]

শশধর মেঘযুক্ত। পদ্মার বক্ষে কৌমুদীহার শোভমান; আকাশ নীল; চন্দ্র-নক্ষত্র সেই নীলাকাশে মণি-মরকত; পদ্মা-সলিলের গর্ভেও মণি-মরকত-খচিত নীলাকাশের নির্ম্মল ছায়া, তরণীর গবাক্ষপথে মুখ বাহির কোরে সেই শোভা আমি দর্শন কোত্তে লাগলেম; শশিবিভূষিণী রজনীতে প্রকৃতির শোভা যেমন সুন্দর দেখায়, ভাবুকের মন সে সৌন্দর্য্যে অপরিচিত নয়, ভাবুকের ভাবে চিরবঞ্চিত থাকলেও সেই নৈশ শোভা সন্দর্শনে আমার নয়ন-মন পুলকিত হোতে লাগলো। সেইখানে আমি দেখলেম, প্রবল পদ্মার আর একটি স্রোত চন্দ্রকিরণে রজতবর্ণ ধারণ কোরে সমানবেগে দক্ষিণদিকে চোলে যাচ্ছে। ভূগোলে লেখা আছে, সে রকম নদীর নাম শাখানদী। আমাদের সারেং অবশ্য ভূগোলবিদ্যায় অপণ্ডিত, বাংলা স্কুলের ছাত্রও নয়, তথাপি তারে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ নদীটির নাম কি?"

সারেং একটি গল্প বোল্লে। যে ভাষায় তার বর্ণনা, পাঠক-মহাশয়েরা সে ভাষায় রসাস্বাদনে তৃপ্তিলাভ না কোত্তে পারেন, এই বিবেচনায় আমি আমার নিজের ভাষায় সারেঙের কথাগুলি এইখানে সুপ্রণালীক্রমে লিপিবদ্ধ কোল্লেম।

এইখানে পদ্মাতীরে একটি লোকালয় ছিল; অনেকগুলি লোকের বাস। এক বৎসর বৈশাখ মাসে এক একটা যোগ হয়, সেই যোগে গঙ্গাস্নানে মহাফল। অগ্রে যারা সে সংবাদ পেয়েছিল, যে দেশে গঙ্গা আছেন, সেই দেশে তারা গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল; পূর্ব্বে যারা সংবাদ পায় নাই, পদ্মাকে গঙ্গার ভগ্নীবিশ্বাসে পদ্মাস্নানেই তারা যোগফল লাভ করবার আশা করে। গ্রামে একঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর ধর্ম্মপত্নী সেই যোগে পদ্মাস্নানে অভিলাষিণী হন। বাড়ীতে একজন দাসী ছিল, তার নাম গৌরী। প্রভাতের গৃহকার্য্যে গৌরীকে নিযুক্ত রেখে ব্রাহ্মণী শীঘ্র শীঘ্র পদ্মাস্নানে আসেন। বেলা চারি দণ্ডের মধ্যে যোগ ছিল, গৌরীও স্নানার্থিনী, গৃহকর্ম্মে তার বেলা হোতে লাগলো, গৌরী বড় ব্যাকুলা, এক হস্তে গৃহমার্জ্জনী-ঝাঁটা, অপর হস্তে গোময়ের হাঁড়ী, সেই অবস্থাতেই গৌরী পদ্মাস্নানে ছুটলো; পথে একটি ফুলগাছে অনেকগুলি ফুল ফুটেছিল, একটা কচুপাতা ছিঁড়ে নিয়ে গৌরী গুটিকতক ফুল তুলে নিলে। আবার ছুট! সকলেই জানেন, পদ্মায় মধ্যে মধ্যে মহা ভাঙ্গন হয়, গৌরী আসছে;—আসতে আসতে দেখলে, পথের মাঝখানে শুষ্ক ভূমিতে একটা চিড়;—[...] সেই ফাটোলে অল্প অল্প জল। ওদিকে সূর্যদেব অনেক দূরে উঠে এসেছেন, বেলা চারিদণ্ড হবার দেরী নাই, ততক্ষণের মধ্যে পদ্মার স্রোত প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব, গৌরী এইরূপ বিবেচনা কোল্লে। যোগ ফুরায়, কি হয়, সাত পাঁচ ভেবে গৌরী সেই ফাটোলের ধারেই বোসে গেল; ঝাড়ু, হাঁড়ি সেইখানে রেখে, কচুপাতার ফুলগুলিতে অঞ্জলি পূর্ণ কোরে সেই ফাটোলের জলেই পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ কোল্লে। অর্পণমাত্রেই ফাটোলের বিস্তার;—জলস্রোত দক্ষিণদিকে ছুটলো; গৌরী কেঁদে উঠলো; "নিলে না মা! আমার পূজা নিলে না মা! দাসী বোলে অবহেলা কোরে চোলে যাচ্চো? আমি তোমায় ছাড়বো না, দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে আমিও যাবো।" স্রোত ক্রমশঃই দক্ষিণদিকে প্রবাহিত; ঝাড়ু, হাঁড়ি তুলে নিয়ে গৌরীও সেই স্রোতের ধারে ধারে প্রধাবিতা, স্রোত ক্রমশঃই বিস্তৃত, ক্রমশঃই বেগবান; যেখানে ফাটোল ধোরেছিল, তার আধ ক্রোশ পর্য্যন্ত জলশায়ী হয়ে গেল; ধারে ধারে গৌরী ছুটেছে; নূতন জলস্রোত যতই ছোটে, গৌরীও ততই ছোটে; জল দাঁড়ায় না; হু হু শব্দে দক্ষিণদিকে গতি; দেখতে দেখতে সেই স্রোত মহা বেগবতী নদী। [...] স্রোত ছুটেছে, গৌরীও ছুটেছে; গৌরী আর পারে না;—পাল্লে না; কেবল 'মা মা, পদ্মা পদ্মা' বোলে উচ্চরবে ডাক দিতে লাগলো;—ডাকেও কিছু হলো না;—গৌরী শেষকালে মা মা বোলতে বোলতে সেই স্রোতের জলে ঝাঁপ দিলে;—গৌরীকে কোলে কোরে পদ্মাবতী সমুদ্রের দিকে ছুটলেন। গৌরীর নামে পদ্মার সেই শাখানদীর নাম গৌরী-নদী;—তীরবর্ত্তী গ্রামবাসীরা এই গৌরী-নদীর নাম দিয়েছে, গড়ুই নদী;—ইংরেজরা নাম দিয়েছেন গোরাই। গৌরী যেখানে ঝাঁটা ফেলে দিয়েছিল, সে স্থানের নাম ঝাঁটাদহ, যে স্থানে পাতিল (হাঁড়ি) ফেলে দিয়েছিল, সে স্থানের নাম পাতিলদহ, যে স্থানে মা মা বোলে ডাক দিয়েছিল, সে স্থানের নাম ডাকদহ। সেই ডাকদহের বর্ত্তমান নাম কুষ্ঠিয়া। পদ্মানদীতে যাঁদের গতিবিধি আছে, তাঁরা সকলেই জানেন, কুষ্ঠিয়া, কুমারখালি, পাংসা প্রভৃতি স্থানের নীচে দিয়ে নির্ম্মলসলিলা নবনদী প্রবাহিতা, সেই নদীর নাম গড়ুই নদী;—গৌরী নামের অপভ্রংশে গড়ুই নামের উৎপত্তি।

পদ্মার এক শাখানদী গৌরী। সারেঙের মুখে গৌরী নদীর উৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ কোরে আমরা চমৎকৃত হোলেম। ওদিকে আমাদের রন্ধনকার্য্য সমাপ্ত হলো, আমরা আহার কোল্লেম। রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর অতীত। [...]

[...] সেই সময় পশ্চাদ্দিকে আমি চেয়ে দেখি, দূরে একখানা নৌকা আসছে, যাত্রীনৌকা। অন্য নৌকা, নির্ণয় কোত্তে পাল্লেম না, খানিকক্ষণ সেই দিকে চেয়ে থাকলেম, ক্রমশঃই সেই নৌকা আমাদের নৌকার দিকে অগ্রসর। আমাদের নৌকা অপেক্ষা সে নৌকার গতি দ্রুত, দেখতে দেখতে নিকটবর্ত্তী তখন আমি দেখলেম, সে নৌকায় অনেক দাঁড়; ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে দাঁড় পোড়ছে, নৌকাখানা যেন তীরবেগে ছুটেছে।

[...] ছীপনৌকা অল্পক্ষণের মধ্যে আমাদের নৌকার নিকটবর্ত্তী হলো, দেখলেম, সেই ছীপের একজন লোক ক্ষুদ্র লণ্ঠন হাতে কোরে ইতস্ততঃ একবার সঞ্চালন কোল্লে, পরক্ষণেই গুড়ুম গুড়ুম শব্দে নৌকার ভিতর থেকে বন্দুকের আওয়াজ হলো, শব্দে আমার বুক কেঁপে উঠলো। [...] পুনর্ব্বার সেই শিকারী-নৌকায় বন্দুকের আওয়াজ। আমি নিরস্ত্র ছিলেম না, আমার সঙ্গে পিস্তল ছিল, ছীপের দিকে চেয়ে পিস্তল বাগিয়ে আমি সতর্ক থাকলেম।

[...] বিপদ আসন্ন। ছীপের লোকেরা

আমাদের উপরেই লক্ষ্য কোরে আসছে। সারেং বোলেছিল, শিকারী-নৌকা; আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে একপ্রকার সেই কথাই ঠিক হয়। শিকারী-নৌকাই বটে। আমরাই সেই শিকারীদের শিকার! [...] আমাদের আক্রমণ করা, তরণী মধ্যে প্রবেশ কোরে অমরকুমারীকে হরণ করা দস্যুদলের আসল মতলব [...]।

যে দিক থেকে আমরা আসছি, সেই দিকে অকস্মাৎ ঘন ঘন গোটাকতক বন্দুকের ধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল। সকলের কর্ণ সেই দিকে স্থির, সকলের চক্ষু সেই দিকে চকিত। [...] চেয়ে আছি, খানিক পরে দেখলেম, সাধারণ খেয়া-নৌকার ন্যায় একখানি তরণী বায়ুভরে ছুটে আসছে, সেই তরণী থেকেই বন্দুকের আওয়াজ আসছে। দেখতে দেখতে সেই নৌকা নিকটবর্ত্তী, আর একখানা বৃহৎ ছীপ। দূর থেকে ক্ষুদ্র নৌকা মনে হয়েছিল, তা নয়, বৃহৎ ছীপ। যে ছীপের উপর বোম্বেটেরা আমাদের প্রাণের উপর আক্রমণ কোচ্ছিল, সেই ছীপের পূর্ব্বগতি অপেক্ষা আগন্তুক ছীপের গতিবেগ আরো অধিক দ্রুত; সে ছীপের দুইদিকে দুই নিশান; সে দুই নিশান ঘোর রক্তবর্ণে রঞ্জিত। [...]

ছীপে ছীপে যুদ্ধ। এক ছীপে বোম্বেটেদল, এক ছীপে সিপাহীদল। [...] উভয় দলে তলোয়ার-যুদ্ধ। কাটাকাটি, রক্তারক্তি, লোমহর্ষণ কাণ্ড! [...] পর পর যুদ্ধে কত লোক নিহত, কত লোক আহত, গণনা করা গেল না, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আমি দেখতে পেলেম, বোম্বেটেরা সকলেই পুলিশ-প্রদত্ত অলঙ্কার পরিধান কোরে, ঘন ঘন বেত্রাঘাতে ছীপের উপর যেন নৃত্য কোত্তে লাগলো। [...]

যুদ্ধের অবসান। প্রকৃতি একপ্রকার স্থির। পদ্মা একপ্রকার শান্ত। আমরা একপ্রকার নির্ভয়। এই সময় সিপাহী-ছীপের একটি ভদ্রলোক আমাদের বজরায় এলেন। দর্শনমাত্রেই আমি চিনলেম, অমরকুমারী-উদ্ধারের যিনি আমাদের প্রধান উত্তরসাধক হয়েছিলেন, তিনিই সেই উদারাশয় ডেপুটিবাবু। সাদরে আমার মস্তকে হস্তার্পণ কোরে মধুরবচনে তিনি বোল্লেন, "হরিদাস! তোমরা তো সকলে অক্ষত শরীরে আছ? দুরাত্মারা কেহই তো বালিকা অমরকুমারীর অঙ্গস্পর্শ কোত্তে পারে নাই?" [...]

বাবুকে অভিবাদন কোরে আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞে না, বোম্বেটেরা কেহই আমাদের অঙ্গে আঘাত কোত্তে পারে নাই; আমার সঙ্গের পাইকেরা, আর বজরার মাঝী-মাল্লারা বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন কোরেছে। বজরার মধ্যে অমরকুমারী কুশলে আছেন।" [...]

আমরা পরিত্রাণ পেলেম। বিপদের রজনী দীর্ঘ হয়; দীর্ঘ রজনীর অবসান। ডেপুটিবাবুর সঙ্গে যখন আমি কথা কোচ্ছি, তখন উষাকাল; ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সমাগত; অল্পে অল্পে সূর্যমণ্ডলের আরক্ত ছবি পূর্ব্বগগনে সমুদিত। তিথি ছিল কৃষ্ণপ্রতিপদ; প্রতিপদের চন্দ্র পশ্চিমগগনে অস্ত যাচ্ছেন, নূতন প্রভাকর পূর্ব্বগগনে উদয় হোচ্ছেন। সুপ্রশস্ত নদীবক্ষে তরণীর উপর থেকে

কামিনীর হাতে বাবু যখন ভেড়া, কালিঘাটের পট, উনিশ শতক

প্রকৃতির সেই শোভা কি চমৎকার দেখায়, যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই সেটি অনুভব কোত্তে পারবেন। সমুদ্রযাত্রী লোকের মুখে আমি শুনেছি, মধ্যসমুদ্র থেকে সেই দৃশ্য আরো সুন্দর দেখায়, আরো চমৎকার! নয়ন মন উভয়ই বিমুগ্ধ হয়। [...]

আমি নাগরদোলায়

আবার আমরা ঢাকায়। বোম্বেটেরা ফৌজদারী আদালতে চালান হয়ে গেল, জখমী লোকেরা হাসপাতালে প্রেরিত হলো, আমরা ডেপুটিবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় পেলেম। হরিহরবাবুর আটজন পাইকের মধ্যে জলযুদ্ধের সময় দুজন নিহত হয়েছিল, বাকী ছিল ছয়জন, তাদের ইচ্ছা ছিল, মাণিকগঞ্জে ফিরে যায়, কিন্তু ডেপুটিবাবু যেতে দিলেন না। ইংরেজ আইন, প্রমাণের উপরেই অধিক পরাক্রম প্রকাশ করে; বোম্বেটে ধরা পড়াতে আবার এক নূতন মোকদ্দমা। [...] বিচারের দিন ধার্য্য হয় নাই; অবসর-প্রতীক্ষায় পাঁচদিন আমরা ঢাকায় থাকলেম।

পুলিশের সাহায্য-প্রার্থনায় আদালতে দরখাস্ত দাখিল উপলক্ষে ইতিপূর্ব্বে একবার ঢাকায় আমি এসেছিলেম; লোকের মুখে শুনা ছিল, পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে ঢাকা খুব ভাল সহর; মুর্শিদাবাদে বাঙলার রাজধানী হবার অগ্রে ঢাকাতেই রাজধানী ছিল। ঢাকা সহর আমার দর্শন করা হয় নাই; দর্শনের অভিলাষ প্রবল; পূর্ব্বযাত্রায় সময় ছিল না, অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই; এই যাত্রায় যদি ঘটে, বঙ্গের এই প্রাচীন সহরটি আমি ভালরূপে দর্শন কোরবো, এই সঙ্কল্প আমার মনে ছিল।

পাঁচ দিন অতিবাহিত। ইতিমধ্যে একদিন মোকদ্দমা ডাক হয়েছিল, আমাদের তলব হয় নাই। আসামীদের হাজতবাসের হুকুম। এই পর্য্যন্ত সে দিনের কার্য্য। আবার কবে দিন ধার্য্য হবে, আর কত দিন আমাদের ঢাকায় অবস্থা কোত্তে হবে, জানতে পারা গেল না। মনে উদ্বেগ থাকলো; কিন্তু সঙ্কল্পসিদ্ধির সময় পেলেম। সহরমাত্রই জনাকীর্ণ। বহুদিকে বহু গলীপথ, বহুদিকেই দোকান-পসার। অজানা লোকের পক্ষে শীঘ্র শীঘ্র সহরের সর্ব্বস্থান চিনে লওয়া সহজ হয় না। ঢাকা আমার পক্ষে নূতন সহর। কোন দিকে কি, কোন দিকে কোন রাস্তা, কোন দিক দিয়ে কোন রাস্তায় যেতে হয়, কোন দিকে গৃহস্থলোকের বাস, কোন কোন দিকে কোন কোন দর্শনীয় পদার্থ, একাকী বাহির হয়ে ঠিক ঠিক সে সব নির্ণয় করা কঠিন; অতএব পল্লীর একটি বালককে আমি পথ-প্রদর্শক-রূপে মনোনীত কোল্লেম। বালকটি আমার সমবয়স্ক, বেশ চালাক-চতুর, কিছু কিছু লেখাপড়াও জানে, নাম অবলাকান্ত।

প্রতিদিন অপরাহ্নে অবলাকান্তকে সঙ্গে নিয়ে আমি নগরদর্শনে বাহির হই। [...]

অবলাকান্ত আমার মনের মত সহচর। যেটি যেটি আমি দর্শন কোত্তে চাই, অবলাকান্ত সেইগুলি আমারে দেখায়, যে যে রাস্তার যে যে নাম, যে যে পদার্থের যে যে প্রকার বর্ণনা, যে যে মহাপুরুষের নামের যে সকল কীর্ত্তি একে একে তন্ন তন্ন কোরে আমারে বোলে বোলে দেয়। বুড়ীগঙ্গার ধারে কোথায় কোথায় জলদস্যুর ভয়, তাও আমারে দেখিয়ে দেখিয়ে চিনিয়ে চিনিয়ে রাখে; যে দিকে ইংরেজটোলা, যে দিকে কোম্পানির বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, বিচারালয়, সাধারণ কার্য্যালয়, কারাগার, সে সকল দিকেও এক একদিন বেড়িয়ে বেড়িয়ে আসি। অষ্টাহকাল এইরূপে আমি অবলাকান্তের সঙ্গে ঢাকা সহরের বহুস্থান সন্দর্শন কোল্লেম। ঢাকার বাঙালীটোলার রাস্তাগুলি, বাজারের রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত, কাশীর বাঙালীটোলার ছোট ছোট গলী যত অপ্রশস্ত, তত অপ্রশস্ত নয়, কিন্তু যানবাহনের চলাচলে সঙ্কীর্ণ। ঢাকার বাজারে অনেক প্রকার জিনিষপত্র অতি সুন্দর। ঢাকাই কাপড়, ঢাকাই স্বর্ণালঙ্কার, ঢাকাই রজতালঙ্কার, ঢাকাই শঙ্খ অতি পরিপাটী। বঙ্গের সকলেই বলেন ঢাকার স্বর্ণকারেরা সোনারূপার উপর যেরূপ সূক্ষ্ম বিচিত্র কাজ কোত্তে পারে, অন্য স্থানের স্বর্ণকারেরা সেরূপ পারে না। বিদেশী লোকের কাছেও ঢাকাই তাঁতি আর ঢাকাই সোনার বিশেষ প্রসিদ্ধ।

নিত্য নিত্য নূতন স্থান দর্শনে নিত্যই আমার নূতন নূতন কৌতূহল। একদিন অপরাহ্নে সহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে গিয়ে পোড়লেম।—একটা মেলা উপলক্ষে সেইস্থানে অধিক জনতা। সেই জনতা ভেদ কোরে আমরা নানা প্রকার তামাসা দেখে দেখে বেড়াচ্ছি, মেলাস্থলে নানা প্রকার জিনিষপত্র বিক্রীত হোচ্ছে, এক একপ্রকার জিনিসের এক একটা পটি বোসে গিয়েছে; তরুণবয়স্ক ভিক্ষুক বালকেরা বহুরূপী সেজে পটিতে পটিতে ভিক্ষা কোরে বেড়াচ্ছে, ছদ্মবেশী, জুয়াচোর ও গাঁটকাটারা উত্তম কৌশলে আপনাদের গুপ্ত মতলব হাসিল কোচ্ছে, বদমাসলোকেরা রকমারী যুবতী স্ত্রীলোকের অন্বেষণে ভিড়ের ভিতর লুকাচুরি খেলাচ্ছে, স্থানে স্থানে গীতবাদ্য হোচ্ছে, একধারে হরিসংকীর্ত্তন বেরিয়েছে, যাত্রাওয়ালা ছেলেরা দিল্লীকা বাইজী সেজে ঘাঘরা ঘুরিয়ে ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে দর্শকের কাছে পয়সা আদায় কোচ্ছে; এই সকল দেখতে দেখতে আমরা সেই ভিড়ের ভিতর পথহারা হোলেম, অবলাকান্তকে হারিয়ে ফেল্লেম। যেখানে মেলা হয়েছিল, সে দিকে আর কোনদিন আমি যাই নাই, সঙ্গীহারা হয়ে ফাঁপরে পোড়লেম। দেখতে দেখতে সূর্য অস্ত, দেখতে দেখতে সন্ধ্যা সমাগত, চতুর্দিক অন্ধকার। আকাশে নক্ষত্রোদয়। [...]

ভূতের বাড়ী

একখানা দোতালা বাড়ীর একটি ঘরে আমি শয়ন কোরে আছি; বড় বড় জানালার ফাঁক দিয়ে প্রখর সূর্য-কিরণ সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ কোচ্ছে; রৌদ্র আমার গাত্র স্পর্শ কোচ্ছে; রৌদ্রের প্রখরতা দর্শনে অনুভব, বেলা দ্বিতীয় প্রহর। কোথায় এসেছি, যে রাত্রে নবীনকালীর হস্তে ফলের সরবত পান কোরেছিলেম, সেই রাত্রের পরদিনের সূর্য আমার গাত্রে উত্তাপ দিচ্ছিলেন কি না, অবধারণ কোত্তে অক্ষম হোলেম। শুয়ে আছি; ঘরের চতুর্দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি, অপরিচিত গৃহ সেটাও বেশ বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু কোথায়?

শয্যার উপর একবার আমি উঠে বোসলেম; বোসে থাকতে পাল্লেম না, ভোঁ ভোঁ কোরে মাথা ঘুরতে লাগলো; মাথা অত্যন্ত ভারী, চক্ষেও ঝাপসা দেখতে লাগলেম। আবার শয়ন কোল্লেম, কত যে কি ভাবনা তখন আমার মানসক্ষেত্রে তোলাপাড়া কোত্তে লাগলো, নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। প্রায় আধ ঘণ্টা এইরকম। একখানা পাখা ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে একজন ভুঁড়িওয়ালা লোক সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লে। আমি শুয়ে ছিলেম, নিদ্রা আসছিল না, দিনমানে কখনই আমার চক্ষে নিদ্রা আসে না, নেত্র উন্মীলিত ছিল, তাই দেখে লোকটি বিকৃতস্বরে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি হে নবাবপুত্র! জেগে আছ? ছি! ছি! ছি! এই বয়সে অত নেশাও করে? দু দিন দু রাত্রি একেবারেই বেহুঁস, বে-একতার! উঠ, স্নান কর, কিছু আহার কর, শরীর তাজা হবে, উঠতে পারবে কি, না এই বিছানার উপর হুড় হুড় কোরে জল ঢেলে দিতে হবে?" [...]

সে কথায় কান না দিয়ে সহসা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কোথায় আমি এসেছি?"

আমার মুখপানে চেয়ে ব্রাহ্মণ বোল্লেন, "ঐ জন্যই তোমার এই দশা! [...] একরত্তি ছেলে, আজিও ফুল ছাড়ে নাই, মুখে এখনো দুধের গন্ধ ঘুচে নাই, এই বয়সেই নেশা ধোরেছ! [...] ভালর জন্য আমি বোল্লেম, "আহার কর"; কথাটা তোমার ভাল লাগলো না; কথার উপর কথা দিয়ে তুমি জিজ্ঞাসা কোল্লে, কোথায় এসেছ?" [...]

তিরস্কার সহ্য কোরে তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম, "আহারে আমার ইচ্ছা নাই। কোথায় আমি এসেছি, সেই তত্ত্বটি অগ্রে আমি জানবো। [...] আচ্ছা মহাশয়, সব কথা না বলুন আমার একটি কথার উত্তর দিন। যেখানে এখন আমি আছি, এ স্থানটি কি ঢাকা জেলার এলাকা?"

ভুঁড়ি নাচিয়ে হাস্য কোরে ব্রাহ্মণ বোল্লেন, "রোগে ধোরেছে, রোগে ধোরেছে! রোগ বড় শক্ত! নেশা এখনো ছাড়ে নাই! [...] হায়, হায়! পাগল রে পাগল! বলে কি না ঢাকা জেলা! কোথায় তোদের ঢাকা জেলা?"

বিষাদে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে পুনরায় আমি বোল্লেম, "তবে কি এটা ঢাকা জেলার এলাকা নয়? কোথায় তবে আমি এসেছি? আমার অজ্ঞাতে কারা আমারে এখানে এনে ফেলেছে?" [...]

বিরক্তবদনে ব্রাহ্মণ তখন বোল্লেন, "কুমিল্লার এলাকা, ত্রিপুরা জেলা, রুদ্রাক্ষ গ্রাম। তুমি কিঞ্চিৎ আহার কর, তারপর অপরাপর কথা জানতে পারবে।" [...]

আমার অন্তরে অত্যন্ত আঘাত লাগলো। ম্লানবদনে ব্রাহ্মণকে আমি বোল্লেম, "বারম্বার কেন আপনি একটা মিথ্যাকথা নিয়ে আমারে ঐরূপ তিরস্কার কোচ্ছেন? নেশা কারে বলে, নেশার জিনিস কি প্রকার, জন্মেও কখন তা আমি জানি না। যারা আমারে অজ্ঞান অবস্থায় এখানে এনে ফেলে রেখে গিয়েছে, তারা আপনাকে কি একটা মিথ্যাকথা শুনিয়ে দিয়েছে, ধ্রুব-বিশ্বাসে তাই আপনি মনে কোরে রেখেছেন, তাই মনে কোরেই বার বার আপনি আমারে অপরাধী কোচ্ছেন! আমি গরীব। জন্মাবধি আমি ফকিরের মতন পর্যটক, দোষের কাছে জন্মাবধি আমি অপরিচিত; পরের মুখে রচা কথা শুনে আপনি আমারে দোষী করেন, শুনে শুনে আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগে!" [...]

যদিও শেষ বেলা, তথাপি তখনো আকাশে সূর্য ছিলেন। বাড়ীখানি আমি ভাল কোরে দেখলেম। প্রকাণ্ড বাড়ী, পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা বৃহৎ বারান্দা; অর্দ্ধেকটা ভগ্নদশাপ্রাপ্ত, চারিদিকে ছোট ছোট থাম দিয়ে ঘেরা ছিল; অনেকগুলি থাম কেবল ইষ্টকসার হয়ে আছে, ফুলগাছগুলিও আধমরা। কিসের শোকে গাছেরা যেন কাঁদছে, এই রকম বোধ হলো। [...]

সূর্যদেব অস্তগত। বেড়াতে বেড়াতে আমরা বাড়ীর দিকে ফিরলেম। যাবার সময় দেখি নাই, আসবার সময় দেখলেম, বাহিরের বারান্দার যে অর্দ্ধাংশ ভেঙে গিয়েছে, সেই অংশের শেষভাগের সর্ব্বপশ্চিম সীমায় একটি ভগ্নগৃহ বিদ্যমান; বাঁশের সিঁড়ির সাহায্য ভিন্ন সে গৃহে প্রবেশ করবার উপায় নাই। একবার পশ্চিমাকাশে, একবার সেই ভগ্নগৃহের দিকে দৃষ্টিদান কোরে, রামদাস তাড়াতাড়ি বোলে উঠলো, "চলো চলো, চলো, শীঘ্র চলো। অন্ধকার হয়ে এলো! এ জায়গায় অন্ধকারে বড় ভয় আছে!" [...]

চুপি চুপি ঘরের ভিতর এসে রামদাস আমার বিছানার কাছে ছোট একখানা চৌকির উপর বোসলো; নানা রকম গল্প জুড়ে দিলো। এ কথা সে কথা পাঁচ কথার পর ঘন ঘন নিশ্বাস নিল, পরে রামদাস একটু কৌতুকস্বরে বোল্লে, "রাম নামের চেয়ে আর নাম নাই; এই নামে ভয় যায়, রাম রাম বোলে শয়ন কোরো, কোন ভয় থাকবে না। এ বাড়ীতে ভূতের ভয় আছে শুনেছি, বড়বাবুও বোলে গেলেন; ভয় আছে সত্য, কিন্তু 'রাম' নাম শুনে ভূতেরা ছুটে পালায়।"

যখনই রামদাস বোলছে, তৎক্ষণাৎ তা আমি বুঝতে পাল্লেম, মনে মনে হাস্য কোরে আমি বোল্লেম, "রাম নামের অভাব কি? তোমার নাম রামদাস, আমার নাম হরিদাস, দুজনেই আমরা রামচন্দ্রের সেবক; তোমারো ভয় নাই, আমারো ভয় নাই।" [...]

আমার আহার-সামগ্রী প্রস্তুত। [...] রাত্রে আমি আহার কোল্লেম।

যতক্ষণ আমি আহার কোল্লেম, সেই পরিচারিকা ততক্ষণ সেই কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকলো; চাউনি কি প্রকার, আড়ে আড়ে চেয়ে চেয়ে এক একবার তাও আমি দেখলেম। আহার যখন প্রায় শেষ হয়ে এলো, সেই সময়

পাচিকাঠাকুরাণী সেই পরিচারিকাকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "রূপসী! যা দুধ-সন্দেশ নিয়ে আয়!"

পরিচারিকার নাম রূপসী। পাচিকার আদেশে রূপসী একবার অন্দরের দিকে গেল; বোলে রেখেছি, বারান্দার পাশেই অন্দর,—শীঘ্রই দুধ-সন্দেশ নিয়ে ফিরে এলো। আহার সমাপন কোরে বাহিরদিকের বারান্দায় আমি আচমন কোল্লেম। আহারান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ অথবা তাম্রকুট সেবন আমার অভ্যাস হয় নাই, সুতরাং সেই দুই দায় থেকে রূপসী অনিচ্ছায় অব্যাহতি পেলে। সাবধানে আমারে শয়ন কোত্তে বোলে পাচিকাঠাকুরাণী চোলে গেলেন, কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ কোরে, কপাটে চাবী লাগিয়ে রূপসীও চোলে গেল, যাবার সময় বোলে গেল, "প্রদীপে অনেক তেল থাকলো, ইচ্ছা হয়, জ্বেলে রেখো, ইচ্ছা হয় নিবিয়ে দিও।"

ঘরে মানুষ থাকলো, দরজায় চাবী পোড়লো, এটাই বা কেমন? এখানেও কি আমি কয়েদী? গতিক ভাল নয়! সেই যে গোড়ায় রক্তদন্তের চক্র, এখনো সর্ব্বত্র সেই চক্রের জের চোলে আসছে; রক্তদন্তের লোকেরা নিশ্চয়ই সেই চক্র ঘুরাচ্ছে! যাই হোক, দক্ষিণদিক খোলা, বাহিরদিকের দক্ষিণের বারান্দা উদার মুক্ত, বাতাসের অভাবে দম আটকে মারা যাব না, মনে তখন এইটুকু শান্তি। [...]

শুয়ে শুয়ে এই সকল আমি ভাবছি, হঠাৎ ছাদের উপর ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর শব্দ। দুম দুম, গুম গুম, দুপ দাপ, ধুপ ধাপ, হুপ হাপ, এই প্রকার বিকট বিকট শব্দ! একবার বোধ হলো, ঠিক যেন আমার মাথার উপর, একটু পরে আবার বোধ হলো যেন আমার শয়নঘরের বারান্দায়, একটু পরে আবার বোধ হলো যেন খানিকটা তফাতে! একবার এখানে একবার ওখানে, একবার ছাদের উপর, একবার বারান্দায়, নানা স্থানে নানাপ্রকার শব্দ! এক একবার বোধ হোতে লাগলো যেন সূতিকাগারে শিশুর ক্রন্দন, এক একবার বোধ হলো যেন কোন বন্যজন্তুর সক্রোধ অস্ফুট গর্জ্জন, একবার শুনলেম যেন দুই তিনজন মনুষ্যের বেতালা নৃত্যের সঙ্গে অট্ট অট্ট হাস্য! [...]

[...] উপর্যুপরি পাঁচ রাত্রি আমি ঐ প্রকার শব্দ শ্রবণ কোল্লেম, একবারও আমার ভয় হলো না; কেবল একটা সন্দেহ বাড়লো মাত্র। যা যা আমি শুনি, কাহারও কাছে প্রকাশ করি না, কেহ জিজ্ঞাসা কোল্লেও সে সব কথা বলি না। [...] বড়বাবু, রামদাস, পাচিকা আর রূপসী, এই চারিজনের সঙ্গেই আমার দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্ত্তা চলে। রূপসী দিবারাত্রির মধ্যে পাঁচ সাতবার আমার ঘরে আসে, কাজ-কর্ম্ম করে, কথা কবার প্রয়োজন না থাকলেও সামান্য একটা অছিলা ধোরে নানা রকম কথা কয়, হাস্যের কারণ না থাকলেও মুখ মুচকে মুচকে হাসে, আমি যখন অন্যদিকে চেয়ে থাকি, রূপসী তখন একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থাকে, ঘর থেকে যখন বেরিয়ে যায়, আমি তখন তার বিলক্ষণ কটাক্ষ-ভঙ্গী দর্শন করি; মনে সন্দেহ আসে।

বাবুর গলায় বিবি ঝুলছেন মালা হয়ে, কালিঘাটের পট, উনিশ শতক

এইভাবে দশদিন আমি সেই বাড়ীতে থাকলেম। [...] থাকতে থাকতে বাবুদের পরিবারবর্গের পরিচয় পেলেম।

পুরুষের মধ্যে কর্ত্তা স্বয়ং আর দুটি পুত্র; স্ত্রীলোকের মধ্যে গৃহিণী, বড়বধূ, ছোটবধূ আর কর্ত্তাবাবুর এক শ্যালকের একটি স্ত্রী; চাকরের মধ্যে রামদাস, চাকরাণীর মধ্যে রূপসী; এইগুলি ছাড়া সেই বৃদ্ধা পাচিকাঠাকুরাণী। বড়বাবুর বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বর্ষ, ছোটবাবুর বয়ঃক্রম ত্রয়োবিংশতি বর্ষ; বড়-বৌমার বয়স বাইশ বৎসর, ছোট-বৌমার বয়স উনিশ বৎসর। কর্ত্তার যে শ্যালক-পত্নীটি বাড়ীতে আছেন, তিনি বিধবা, বয়স অনুমান তেইশ চব্বিশ বৎসর; দেখতে দিব্য সুশ্রী, বর্ণ গৌর, সে গৌরবর্ণের উপর রক্তবর্ণ আভা; কর্ত্তা সেটিকে রাঙা-বৌ বোলে আদর করেন, গৃহিণীও বলেন, রাঙা-বৌ। সেই রাঙা-বৌটি ছেলেবাবুদের মামী হন; রামদাস আর রূপসী সেই সম্পর্কে রাঙা-বৌকে রাঙামামী বোলে সম্মান দেয়।

[...] এ বাড়ীর ভিতরমহল বাহিরমহল প্রায় এক, কেবল একটি বারান্দা মাত্র ব্যবধান; তথাপি আমি প্রথম প্রথম কেবল বাহির-মহলেই থাকতেম, নারী-মহলে প্রবেশের অনুমতি পেতেম না, বেশীদিন থাকতে থাকতে আমার রীতি চরিত্র দেখে, কর্ত্তা আমারে অন্দরে গিয়ে আহার করবার অনুমতি দিলেন। সেই কর্ত্তা; যিনি আমারে নেশাখোর ভেবে অগ্রাহ্য কোরেছিলেম, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ঝেড়েছিলেন, একমাস পূর্ণ হোতে না হোতেই সেই কর্ত্তা আমার প্রতি সুপ্রসন্ন।

ভিতরমহলে আমি প্রবেশ করি, গৃহিণীকে আমি মা বোলে ডাকি, বৌ দুটী আমারে দেখে ঘোমটা দেন, রাঙা-মামী ঘোমটা দেন না। দুই বেলা আহারের সময় বাড়ীর ভিতর আমি যাই, অন্য কোন প্রয়োজন উপস্থিত হোলেও অন্দরে আমার ডাক পড়ে; অবাধ গতিবিধি; কিন্তু রাত্রিকালে? শয়নটা আমার বাহিরেই হয়। বাহিরে শয়ন করি বটে, কিন্তু রাত্রিকালে সমস্ত কলরব নিবৃত্তি হোলে ভিতরমহলের উচ্চ উচ্চ কথাবার্ত্তা আমার শ্রবণগোচর হয়। আমার শয়ন-ঘরের ঠিক পাশেই অন্দর; বারান্দার দরজা পার হয়ে অন্দরের পথের বামদিকে যে ঘরটী, রাত্রিকালে সেই ঘরে রাঙা-মামী শয়ন করেন, সেই ঘরের

পশ্চিমের দুটি ঘরে বড়বাবু আর ছোটবাবু। সেই তিনটি ঘর উত্তরদ্বারী পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ। অপর ধারে ঐরূপ তিনটি ঘর দক্ষিণদ্বারী; একটিতে কর্ত্তা-গৃহিণী থাকেন, একটিতে পাচিকা আর রূপসী, তৃতীয়টী ভাঁড়ার ঘর। একটি ঘরে আমি থাকি, তার পাশে পূর্ব্বদিকের একটী ঘরে রামদাস শয়ন করে, তৃতীয় ঘরটী খালি থাকে। [...]

প্রতি রজনীতে আমি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর শব্দ শুনি, কোথা থেকে শব্দ আসে, কারা সেই সকল শব্দ করে, কিছুই আমি ঠিক কোত্তে পারি না; দিনের বেলা আমি কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করি না। সেইভাবে প্রায় একমাস গেল। [...]

বেলা শেষ হয়ে এলো। আমি একাকী সেই ঘরটিতে বোসে আছি, রূপসী এসে আমারে ডেকে গেল; বোলে গেল, রাঙামামী ডাকছেন।

রাঙামামী আমারে কেন ডাকেন? রাঙামামী আমারে দেখে লজ্জা করেন না, কোন কিছু আবশ্যক হোলে আমারেই এনে দিতে বলেন, এই পর্য্যন্তই আমি জানি। দাসী দিয়ে তিনি আমারে ডেকে পাঠাবেন, এটা আমার জানা ছিল না। কি করি, চাকুরী সম্পর্ক না হোলেও এঁদের বাড়ীতে আমি আছি, আমার উপর কর্ত্তার প্রভুত্ব চলে, ভাবতে গেলে এক রকম আমি চাকর। যেতে হলো।

ভিতরমহলে আমি প্রবেশ কোল্লেম। এইখানে আমারে একটু অনধিকারচর্চ্চা কোত্তে স্বাধীনতা নিতে হলো। পূর্ব্বে বোলে রেখেছি, রাঙামামী বিধবা, রাঙামামী পরমা সুন্দরী। এই দিন আমি যে ভাবে তাঁরে দেখলেম, তাতে আমার এক মহা সন্দেহ দাঁড়ালো। অলঙ্কার-বস্ত্রে সুশোভিতা, অলক্তকরাগরঞ্জিতা, মণি-মণ্ডিত-কবরী-বিভূষিতা সেই রাঙামামী একটি নির্জ্জন গৃহে একাকিনী। তাঁর দুটি চক্ষে জলধারা। এই সুন্দরীর রূপ বর্ণনা করা আমার অনধিকারচর্চ্চা। বিধবা যদি বিধবার মত ব্রহ্মচারিণীরূপে অধিষ্ঠিতা থাকতেন, তা হোলে সে দিকে চেয়ে দেখতে মানুষের মন পুলকিত হতো, দুষ্টের নয়ন ঝলসে যেতো। এ মূর্ত্তি সে মূর্ত্তি নয়, গৌরবর্ণের উপর গোলাপী আভা, অধরোষ্ঠে গোলাপী আভা, কপোলযুগলে গোলাপী আভা, বিশাল নয়নে বক্রদৃষ্টি। বক্ষঃস্থলে নীলবর্ণ কাঁচুলী; সেই কাঁচুলীর অর্দ্ধাংশ নীলবসনে ঢাকা। সম্মুখে গিয়ে আমি নত-নয়নে নত-বদনে দাঁড়ালেম। মৃদু হেসে মামী বোল্লেন, "বোসো হরিদাস, তুমি অমন ভয় পাচ্ছো কেন? তুমি না কি ভূতের ভয় পেয়েছ?"

আমি বোসলেম না, ভূতের ভয়ের কথাতেও কোন উত্তর দিলেম না। রাঙামামী আবার বোল্লেন, "রামদাস আমারে বোলে গেল, তুমি ভূতের ভয়ে কাতর আছ। ছি! ভূতকে কি ভয় করে? আমি তো মেয়েমানুষ, অন্য অনেক রকম ভয় আমার আছে, কিন্তু ভূতের ভয় আমি রাখি না। বাড়ীতে এক রকম শব্দ হয়। এত বড় বাড়ীখানা, কত লোক এ বাড়ীতে থাকতো, এখন গুটিকতক অস্থি-চর্ম্মসার ক্ষুদ্র প্রাণী খেলা কোরে বেড়ায়, সমস্ত বাড়ীখান ফাঁকা; তাতে কোরেই রেতের বেলা বাতাসের শব্দকেও যেন বড় বড় কামানের শব্দ মনে হয়। তাতে তুমি ভয় পেয়ো না; কোথায় কি শব্দ হোচ্ছে, জানবার জন্য বিছানা থেকে উঠো না, উঁকি মেরে দেখো না, হাঁকাহাঁকি কোরে গোলমাল কোরো না! দেখ ভাই [...] দেখ হরিদাস, তোমার উপর আমি বড় সুখী আছি। আজ তুমি আমার একটি উপকার কর।" [...]

উত্তমরূপে তাঁর মুখখানি নিরীক্ষণ কোরে, ধীরে ধীরে আমি বোল্লেম, "উপকার?—আমার দ্বারা আপনার কি উপকার হোতে পারে?"

রাঙামামী উঠে দাঁড়ালেন; ঘরের পূর্ব্বপ্রান্তে ক্ষুদ্র একটী তোরঙ্গ ছিল, সেইটী খুলে কি একটী পদার্থ হাতে কোরে নিয়ে আমার কাছে ফিরে এলেন। [...] সেই পদার্থটী আমার হাতে দিয়ে আমার পিঠ চাপড়ে চাপড়ে তিনি বোল্লেন, "তুমি বেশ ছোক্‌রা, খুব বুদ্ধিমান, এই জিনিসটি নিয়ে গিয়ে অমুক জায়গায় অমুক ঠিকানায় অমুক বাড়ীর সেজোবাবুর হাতে দিয়ে এসো। [...] এ মোড়কে ওষুধ আছে। সঙ্গোপনে দিও কেহ যেন দেখে না, কোন লোকের কাছে কোন কথা প্রকাশ কোরো না, আমাদের রামদাসকেও কিছু বোলো না।" [...]

মনে কোরেছিলেম, রাত্রে ভূত দেখবার কথা আছে, রাত জাগতে হবে, আজ আর বেড়াতে যাব না, কিন্তু রাঙামামীর দৌত্য কার্য্যে সে সঙ্কল্প অটল রাখতে পাল্লেম না, সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাপড় ছেড়ে সম্মুখ-রাস্তায় বাহির হোলেম। কেহই আমারে তখন দেখতে পেলে না। নদীর তীরে রাস্তাটা আমার জানা হয়েছিল, সরাসর সেই রাস্তায় গিয়ে সেই আমবৃক্ষের তলে আমি দাঁড়ালেম। হস্তে সেই বর্ত্তুলাকার পত্রিকা। [...]

দাঁড়িয়ে আছি, প্রায় অর্দ্ধদণ্ড পরে একটী বাবু সেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন। এসেই তফাৎ থেকে তিনি জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগলেন, "কে গা? কে আমার তত্ত্ব কোচ্ছে?"—প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এগিয়ে আসতে লাগলেন, আমি সেই সময় তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেম। সূর্যদেব চোলে গিয়েছিলেন, অন্ধকার হয় নাই, বাবুটি আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, আমিও তাঁর মুখের দিকে চাইলেম। বেশ বাবুটী। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চোখ-দুটী বড় বড়, ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া বাবরী চুল, মাঝখানে সিঁতিকাটা। চুলের কেয়ারীতে কলিকাতার ধরন অনেকটা জানা যায়। বোধ হলো এ বাবুটীর কলিকাতায় গতিবিধি আছে।

রাঙামামীর দত্ত-মোড়কটী বাহির কোরে দেখিয়ে আমি বোল্লেম, "একটি ওষুধের মোড়ক আছে; আপনার হাতে দিবার আদেশ।" [...]

বাবু তখন পূর্ব্বস্মৃতির প্রসন্নতা লাভ কোরে প্রফুল্লবদনে বোল্লে, "ও—হো হো! বটে, বটে। একটী স্ত্রীলোক আমাকে একটী ঔষধ দিবেন স্বীকার কোরেছিলেন, মনে পোড়েছে!" সেজোবাবু দক্ষিণ হস্ত বিস্তার কোল্লেন, আমি সেই মোড়কটী তাঁর হস্তে অর্পণ কোল্লেম। [...]

সন্ধ্যার পর বাড়ীতে আমি ফিরে এলেম। [...] আহারের সময় রাঙামামী একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আমার চক্ষের দিকে চাইলেন, আমিও সেই রকমে চেয়ে ঈষৎ মস্তকসঞ্চালনে সঙ্কেতে সঙ্কেতে তদুত্তর দিলেম। রাঙামামী বুঝ্‌লেন, দৌত্যকার্য্যে আমি কৃতকার্য্য।

আহারান্তে বাহিরের ঘরে আমি প্রবেশ কোল্লেম। রামদাস সেইখানে ছিল। অন্যদিন সে সময় কেহ থাকে না, রামদাস সে দিন কেন ছিল, একটু একটু আমি বুঝতে পাল্লেম। ভূত দেখাবার কথা। রামদাস আমার কাছে উপস্থিত থেকে ভূতের খেলা দেখাবে, তাই যেন আমার মনে হলো। রামদাস বোসে ছিল, আমারে দেখে উঠে দাঁড়ালো; চুপি চুপি বোল্লে, "ভূত যদি দেখতে পাও, গোলমাল কোরো না, কাহাকেও ডেকো না, চুপ কোরে শুয়ে থেকো, ভূতেরা তোমাকে কিছুই বোলবে না; যদি গোলমাল কর, হাঙ্গামা বেধে যাবে। শয়ন কর। দুই প্রহরের পূর্ব্বে নিদ্রা যেয়ো না, আমার কথাগুলি মনে রেখো।" [...]

রাত্রি দুই প্রহর অতীত। আমার নিদ্রা নাই। ভূতের সঙ্গেও সাক্ষাৎ নাই। রামদাস যে কথা বোলেছিল, সে কথা আমার মনে মনে জাগছিল, আমিও জাগছিলেম, কথাও জাগছিল, কিন্তু কিছুই না; নিত্য রাত্রে শব্দ হয়, সে রাত্রে শব্দ পর্যন্ত স্তব্ধ। আমার শিয়রের কাছে একটা খড়খড়ী, সে খড়খড়ীর পাখীগুলি আমি খুলে রেখেছিলেম। রাত্রি যখন প্রায় তৃতীয় প্রহর, সেই সময় আমার ঘরের ভিতর কেমন একরকম আলো এলো; ভাগ ভাগ করা আলো। [...] রংমশালের আলোর বর্ণ যেরূপ, সে আলোর সেইরূপ বর্ণ, এলো আর গেল; বিদ্যুতে আলো যেমন আসে আর যায়, ঠিক সেই প্রকার। এ তবে কি? এই বুঝি তবে ভূত? বিছানার উপর আমি উঠে বোসলেম, অনেকক্ষণ বারান্দার দিকে আমি চেয়ে থাকলেম, প্রকৃতি যেমন নিস্তব্ধ, ঠিক সেই ভাব, কৌমুদীর যেমন খেলা, ঠিক সেই ভাব। একবার যে আলো আমি দেখলেম, সে আলো আর এলো না, ঘরের ভিতর তো এলোই না, বাহিরেও জ্যোৎস্নার কোলে সেরূপ মিশ্রবর্ণের আলো দেখা গেল না। [...]

দিন দিন এ বাড়ীতে ভূতের উৎপাত বেশী হোতে লাগলো। আমি কিছুই দেখতে পাই না, কেবল শুনতে পাই। আহা! ভূতগুলির লীলা-খেলা চিরকালের মত ফুরিয়ে যাবে, এই দুঃখে আমার বড় কষ্ট হয়। [...]

আমার নিদ্রা নাই। উপাধানের উপর মুখ রেখে, শিয়রের খড়খড়ীপথে আমি চেয়ে আছি, বোধ হলো যেন, ফর্শা কাপড়পরা দুই মূর্ত্তি সাঁ কোরে বারান্দা দিয়ে ছুটে গেল। মনের খেয়ালের সঙ্গে নয়নের ভ্রম হয়; আমার বোধ হয় তাই। লোকের মুখে শুনছিলেম ভূত, মনে মনে ভাবছিলেন ভূত, রাত্রিও অন্ধকার ছিল, কোথাও কিছু নাই, যুগলমূর্ত্তি ছুটে গেল, আর তারা ফিরে এলো না; দৃষ্টির ভ্রমটাই যেন ঠিক দাঁড়ালো। যুগল হস্তে যুগল নয়ন মার্জ্জন কোল্লেম। যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার;—ঘরে বাহিরে সমান অন্ধকার।

চন্দ্রমা তখনো অদৃশ্য।

বারান্দাতে ঘন ঘন গুম গুম শব্দ। ইতিপূর্ব্বে যে দুই মূর্ত্তি দেখেছিলেম,—দেখেছিলেম বোলে জ্ঞান হয়েছিল, যে রকম মূর্ত্তি কিছু দেখা গেল না, কেবল শব্দ। একবার শুনলেম, দুই তিন কণ্ঠমিলিত অস্ফুট হাস্য; বারান্দার দ্বার উন্মুক্ত ছিল, মনে কোল্লে উঠে দেখতে পাত্তেম, কেহ কোথাও আছে কি না,—যারা আমারে সাবধান করে, তারা বলে, "শব্দ শুনে উঠো না, তত্ত্ব জানবার চেষ্টা কোরো না," সেই কথা মনে কোরে বিছানা থেকে আমি উঠলেম না, শব্দও থামলো না, ঠিক আমার মাথার কাছে শব্দ; এক একবার একটু দূরে যায়, আবার সেইখানে ফিরে আসে; শব্দেরই চলাচল, পদার্থ দৃষ্ট হয় না। [...]

প্রায় এক ঘণ্টা এই ভাব। আকাশে চন্দ্রোদয়। চন্দ্রালোকে বাহিরের পদার্থগুলি আমার নয়নগোচর হোতে লাগলো, শব্দগুলোও শ্রবণগোচর হোতে লাগলো, সংশয়ে বিস্ময়ে আমি জড়ীভূত।

কট্ কট্ কোরে চাবী খোলার শব্দ হলো। একজন লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লে। [...] বিছানার উপর আমি উঠে বোসলেম; ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এত রাত্রে এখানে তুমি কি চাও রামদাস?"

রামদাস চুপি চুপি বোল্লে, "তোমারে চাই। উঠ। যে সব কথা তোমাকে আমরা বলি, তাতে তুমি বিশ্বাস কর না, শব্দ হয় শুনতে পাও, অলৌকিক শব্দ মনে কর; সত্য বটে অলৌকিক, কিন্তু কিছু বিশেষ আছে। উঠে এসো; দেখবে এসো।" [...]

নিঃশব্দে রামদাসের সঙ্গে সঙ্গে আমি বারান্দায় উপস্থিত হোলেম। পশ্চিমদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কোরে আমার কানের কাছে রামদাস চুপি চুপি বোল্লে, "ঐ দেখ!" [...]

চন্দ্রদেব তখন আমাদের মশালচির কাজ কোল্লেন। পশ্চিমদিকে আমি চাইলেম। পাঠকমহাশয়ের স্মরণ আছে, সম্মুখ-বারান্দার অর্দ্ধাংশ ভগ্ন, সেই ভগ্নাংশের সর্ব্বশেষে একটা ভগ্নগৃহ, সেই গৃহের সম্মুখভাগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোটাকতক মুণ্ড, এত প্রকাণ্ড যে, এতদ্দেশে ঢাকাই জালার যেরূপ প্রসিদ্ধি, সেই প্রসিদ্ধির অনুগত জালার আকারে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর মুণ্ড দুর্গার পদতলের পশুরাজ সিংহের যে প্রকার বর্ণ, মুণ্ডগুলোর বর্ণ সেই প্রকার। নাসিকাও সিংহনাসা সদৃশ। সুন্দরবন অঞ্চলে বনদেবতার পূজায় কালুরায় দক্ষিণরায় নামে বুনোরা যেরূপ বিগ্রহ গঠন করে, সেই সকল বিগ্রহের চক্ষের ন্যায় ভয়ানক ভয়ানক বড় বড় চক্ষু। বন্যবরাহের মূলদন্ত যে প্রকার, সেই সকল মুণ্ডের দন্তপাতি তদ্রূপ বৃহৎ বৃহৎ। সিংহের জটার ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ কেশর বৃহৎ বৃহৎ কর্ণের উভয় পার্শ্বে বিলম্বিত। দূর থেকে দর্শন কোল্লে বাস্তবিক অন্তরে দারুণ ভয়ের সঞ্চার হয়। মুণ্ডগুলা সারি সারি সংস্থাপিত।

[...] একটি লোক সেই সময় মন্থরগতিতে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। পরিচ্ছদে ভদ্রলোক, দৃষ্টি কিছু কুটিল, মস্তকে লম্বা লম্বা চুল, সম্মুখভাগে কুঞ্চিত, চুলের বাবরীতে কান দুটি ঢাকা, মাথায় একটি মৌলবী কেতার তাজ, ডানদিকে বক্রভাবে হেলা, এত হেলানো যে, লোকটির ডান কানটি আছে কি না জানা যায় না।

অভ্যর্থনা কোরে হাসতে হাসতে বড়বাবু বোল্লেন, "আসুন পায়রাবাবু, আসুন; অনেক দিনের পর আজ আপনার দর্শন পেলেম, সংসারের সমস্ত মঙ্গল ত?" [...]

চেয়ে আমি পায়রাবাবুর মুখের দিকে; মনে হলো মূর্ত্তি যেন আমার চেনা। আর কোথাও দেখেছিলেম কি না, ঠিক স্মরণ কোত্তে পাল্লেম না, কিন্তু এই রুদ্রাক্ষ গ্রামেই তাঁরে আমি দেখেছি, এইরূপ যেন অবধারণ কোল্লেম। গ্রামের কোথায় দেখা, সেটি স্মরণ কোত্তেও অধিক বিলম্ব হলো না। [...] গতরাত্রে ভূতের উৎসবের সময় মুখে মাথায় রুমালবাঁধা যে লোকটি ভিড়ের ভিতর দর্শন দিয়েছিলেন, কুকুরেরা যাঁর গায়ে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠেছিল সেই লোক। মুখখানি তখন ঢাকা ছিল, নাকটি আর চক্ষুদুটি খোলা ছিল। ঠিক চিনতে পারি নাই, একটু একটু সন্দেহ হয়েছিল। আজ এই সময় অনাবৃত মুখমণ্ডল দর্শন কোরে সেই সন্দেহভঞ্জন হয়ে গেল। সত্যই বড়বাবুর পায়রাবাবুটি সেই লোক। আমি যেমন স্থির কোল্লেম সেই লোক, বড়বাবু আর ছোটবাবু সে রকম স্থির কোত্তে পাল্লেন কি না, লক্ষণ দর্শনে তেমনটি নিশ্চয় কোত্তে আমি অক্ষম হোলেম।

মুখ ঢাকা দেখেছিলেম, খোলামুখ দেখলেম, মনে মনে চিনতে পাল্লেম। কেবল তাও নয়, আর কোথায় দেখেছি। মনে মনেই তর্ক, মনে মনেই নিশ্চয়। নদীতীরের আম্রবৃক্ষতলে একটি সেজোবাবু আমি দেখেছিলেম। রাঙামামীর প্রেরিত দূতস্বরূপ যাঁর হস্তে আমি সেই ঔষধের মোড়ক সমর্পণ কোরেছিলেম, ইনিই সেই সেজোবাবু। সাক্ষী আমার চক্ষু আর আমার মানসিক স্মৃতি। এই পায়রাবাবুই সেই সেজোবাবু।

কথা কিছু ভাঙলেম না। পায়রাবাবু মধ্যে মধ্যে আমার দিকে কটাক্ষপাত কোচ্ছিলেন, কটাক্ষপাতে আমিও তাঁর সেই কটাক্ষ দর্শন কোচ্ছিলেম। বস্তুতঃ তাঁর দর্শন আর আমার দর্শনের ভাব স্বতন্ত্র। ভূতের গল্প আরম্ভ হলো। সেই

রক্ষিতার সঙ্গে বাবুর রঙ্গ, কালিঘাটের পট, উনিশ শতক

সময় আমি দেখলেম, প্রবেশকালাবধি এতক্ষণ পর্য্যন্ত পায়রাবাবুর মুখের ভাব যে প্রকার ছিল, সে ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন। কোন প্রসঙ্গ শ্রবণের ইচ্ছা না থাকলে শ্রোতা যেমন ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হয়, কোন পুরাতন বৃত্তান্ত আপন কৃতকার্যের ন্যায় ভেবে নিয়ে সে যেমন ম্রিয়মাণ হয়, চাঞ্চল্যের হেতু উপস্থিত না থাকলেও সে যেমন ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হয়ে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরায় কিম্বা পলায়নের পন্থা দেখে, মিহিরচাঁদের মুখে ভূতের গল্পের ভূমিকা শুনেই পায়রাবাবুর বাহ্যভাব সেই প্রকার। ভাবটা আমি বিশেষরূপে লক্ষ্য কোল্লেম। কি আমি লক্ষ্য কোচ্ছি, পায়রাবাবু হয় তো ঠিক সেটা অনুভব কোত্তে পাল্লেন না। অল্পক্ষণ পরেই অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন; বড়বাবুর দিকে চেয়ে গদগদবচনে বোল্লেন, "রাত্রি হয়, স্থানান্তরে আমার আজ একটা কাজ আছে; এখন আমি চোল্লেম, অবকাশমতো আর একদিন এসে সকল কথা শুনবো।" পায়রাবাবু দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হোলেন। [...] শশবস্তে গাত্রোত্থান কোরে, ছোটবাবু বারান্দায় বেরিয়ে পশ্চাতে ডাকলেন;—ডেকে ডেকে বোল্লেন, "পায়রাবাবু! পায়রাবাবু! চোল্লেন আপনি? একটু দাঁড়ান; আপনার কুকুরগুলি নিয়ে যান।" [...]

ঝুমুর ঝুমুর শব্দে শৃঙ্খলবাদন কোত্তে কোত্তে সাতটি কুকুর সেইখানে উপস্থিত হলো। আমাদের কাহারো মুখে বাক্য থাকলো না। কুকুরেরা সানন্দ-গুঞ্জনে লম্ফে ঝম্ফে দ্রুত ধাবিত হয়ে পায়রাবাবুর গায়ে মাথায় আরোহণ কোত্তে লাগলো। সেই ক্রীড়া দর্শনে বড়বাবু ছোটবাবু উভয়ে বিস্ময়াপন্ন, আমি কিন্তু কিছুমাত্র বিস্মিত হোলেম না। গত রাত্রে বহুরূপীর মত ছদ্মবেশে এই পায়রাবাবু এইখানে উপস্থিত ছিলেন, কুকুরেরা গত রাত্রে এই মূর্ত্তির নিকটে এইরূপ অভিনয় কোরেছিল, আমি সেটি জানতে পেরেছিলেম, সেই কারণেই আমার মনে বিস্ময়ের উদয় হলো না। আজ রাত্রে আবার সেই প্রকার অভিনয়ে আমি নিজেই এই অভিনয়ের সূত্রধার।

সিঁড়ির পথে ছোটবাবুর আহ্বানে পায়রাবাবু যখন দ্বিতীয়বার উপরে উঠে আসেন, সেই সময় আমি নীচে গিয়েছিলেম; রামদাসকে ক্ষেত্রকর্ম্মের পরামর্শ দিয়াছিলেম। সেই পরামর্শের ফলে কুকুরের প্রবেশ। কুকুরের অভিনয়, সুতরাং আমি এই অভিনয়ের সূত্রধার। [...]

আমতা আমতা কোরে পায়রাবাবু বোল্লেন, "আমি?—আমি?—আমি কেন? আমি কেন?—এ সব কুকুর আমি—" এইরূপ অসম্বন্ধ কথা বোলতে বোলতে হাতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে গায়ের কুকুরগুলিকে তিনি তাড়িয়ে দিবার চেষ্টা কোল্লেন, দূর দূর বোলে ধমক দিলেন, কুকুরেরা সে ধমক মানলে না, শুনলে না, গ্রাহ্যই কোল্লে না; যতই তিনি ফেলে ফেলে দেন, নূতন খেলা মনে কোরে কুকুরেরা ততই আহ্লাদে লাঙ্গুল সঞ্চালন কোরে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে বার বার তাঁর গায়ে উঠে।

টাকা যদি মেকী হয়, সে টাকার গায়ে অনেক রকম নিশানা থাকে, মানুষের কপটতারও নিশানা আছে। কপট বিরক্তি দেখিয়ে পায়রাবাবু সেই কুকুরগুলিকে চপেটাঘাত মুষ্ট্যাঘাত উপহার দিতে আরম্ভ কোল্লেন; মুখে বোলতে লাগলেন, "এ কি উৎপাত! কোথাকার উপসর্গ! কোথাকার কুকুর এ সব! কেন আমাকে—কেন আপনারা—কেন আমি—কুকুর নিয়ে—" [...]

কাহারো কোন কথাই পায়রাবাবু শুনলেন না; গায়ের উপর থেকে কুকুরগুলিকে ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুখ ভারী কোরে উঠে সটান চঞ্চলচরণে এককালে বাহিরের রাস্তায় উপস্থিত হয়েই ছুট। বড়বাবু, ছোটবাবু আর আমি, তিনজনেই বাহিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পায়রাবাবুর ছুটের ঘটা দেখলেম; তিনজনেই হাস্য কোল্লেম; তিনজনেই রামদাসের প্রতি ইঙ্গিত কোরে যথাকর্ত্তব্য আদেশ দিলেন। রামদাস তৎক্ষণাৎ সে কুকুরগুলির গলার শিকলগুলি খুলে নিয়ে সদরদরজায় বাহির কোরে দিয়ে দরজা বন্ধ কোরে দিলে। বন্ধ করবারও আবশ্যক ছিল না, দরজা খোলা থাকলেও কুকুরেরা বাড়ীর ভিতর ফিরে আসতো না। রাস্তার ধূলা আঘ্রাণ কোত্তে কোত্তে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত ছুটে ছুটে তারা সেই পলায়িত মনিবের পথানুসরণ কোল্লে; দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল। এইখানেই এ নাটকের যবনিকা-পতন।

পাগলা বাগান!

অনাদি-দম্পতি প্রস্থান করবার পর আমার মনে আর নূতন কথা কিছুই এলো না, কেবল চিতোরীর কথাই আলোচনা কোত্তে লাগলেম। ভারী মজা—কি রকম মজা! নিমন্ত্রণে!—নিমন্ত্রণে মজা কি আছে? কি মজা তারা আমারে দেখাবে? মজা আমি অনেক দেখেছি; মজা দেখিয়ে দেখিয়ে মজার লোকেরা আপনারাই মজে গিয়েছে; এক এক স্থলে এক এক ঘটনায় আমারেও মজিয়েছে। এখানে কি রকম মজা? অনেক চিন্তা কোল্লেম, অনুমানে কিছুই এলো না। [...]

বেলা যখন প্রায় তৃতীয় প্রহর, সেই সময় একটি সুন্দরী রমণী দেখা দিল। সুন্দরী শুভ্রবর্ণা, পট্টকেশী, মার্জ্জারনেত্রা, কৃষ্ণবসনা। রমণী আমার প্রতি দুই তিনবার কটাক্ষপাত কোল্লেন, আমিও দুই তিনবার তাঁর প্রতি কটাক্ষপাত কোল্লেম, এই পর্য্যন্ত কার্য্য। কটাক্ষবিনিময়েই কার্য্যের উপশম হয়। একটিও বাক্যব্যয় না কোরে রমণী ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। অল্পক্ষণ পরে একটি সাহেবের প্রবেশ। সাহেবটি খর্বাকার; স্বাভাবিক খর্বাকৃতি স্থূল স্থূল বসনাবরণে আরো যেন অধিক খর্ব বোধ হলো; মাথায় একটা ছত্রাকার টুপী, হস্তে একগাছি অশ্বচালনের চাবুক। আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে দন্তদ্বারা বামহস্তের অঙ্গুলীর একটি নখ কর্ত্তন কোত্তে কোত্তে, সাহেবটি খানিকক্ষণ আমার সার্কাস নিরক্ষণ কোল্লেন; তারপর ছোট ছোট ইংরেজী কথায় আমারে গুটিকতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেন। সাধ্যমত সাবধানে অর্থ বুঝে বুঝে আমি তাঁর প্রশ্নগুলির যথাসম্ভব সদুত্তর প্রদান কোল্লেম। সাহেব আর দাঁড়ালেন না; ঘন ঘন পদবিক্ষেপে চাবুকগাছটি নাচাতে নাচাতে, আপন মনে শীস দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই আর একটি লোক। ইত্যগ্রে একদিন সবুজ পাগড়ী মাথায় দিয়ে যে লোকটি আমারে দেখে গিয়েছিলেন, আমি যাঁরে এই আশ্রমের জমাদার মনে কোরেছিলেম, সেই লোক। গজেন্দ্রগমনে সেই লোকের প্রবেশ। [...]

আবার অন্যদিকে আমি চোল্লেম। এক বৃক্ষডালে একটা স্ত্রীলোক; মাথা হেঁট কোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিক ফিক কোরে হাসছে, এক একবার চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে; তার চক্ষে যেন জোনাকী-পোকা জ্বোলছে। স্ত্রীলোকটা সুন্দরী ছিল; এখনো বয়স অল্প, সৌন্দর্যের কিছু কিছু চিহ্ন তার মুখে চক্ষে এখনো বিদ্যমান। মাথার চুল নাই সেই কারণে মুখশ্রী প্রতি মানুষের চক্ষু ততটা আকৃষ্ট হয় না। পরিধান একখানা লালপেড়ে শাড়ী, শাড়ীর আঁচলটা ভূতলে লুণ্ঠিত হোচ্ছে, স্ত্রীলোকটা হাসছে। সম্মুখ দিয়ে আমি চোলে যাচ্ছিলেম, হাতছানি দিয়ে পাগলী আমারে ডাকলে। কাছে গেলেম না, একটু তামাসা দেখবার অভিপ্রায়ে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়ে আমি দাঁড়ালেম। হস্তসঙ্কেতে, নেত্রসঙ্কেতে, হাবভাব দেখিয়ে পাগলী বোলতে লাগলো, "এসেছিস? হাঁ—হাঁ—হাঁ! তেমনি কোরে কি পালিয়ে যেতে হয়? হা—হা—হা। তেমনি কোরে বুঝি বিয়ে করে? হাঃ—হাঃ—হাঃ! যারে যারে আমি বিয়ে কোরবো মনে করি, তারাই অমনি কোরে পালায়, হী—হী—হী! আচ্ছা ভাই! প্রেমধন, যৌবনধন, প্রাণধন যারে আমি দিতে চাই, সে কেন পালায়? তুমি কেন পালালি? হী—হী—হী! এরা আমাকে এইখানে এনেছে। বলে কি না—বলে কি না, এইখানেই আমার বিয়ে দিবে, হী—হী—হী! বিয়ের বর যে আমার কোথায় তা এরা খুঁজে পাবে না। সেই যে বরটি,—যে আমারে বোলে গিয়েছে,—'বাঁচি তো বসন্তকালে দেখা হবে আর বছর!' সে বরটি যে কোথায় গেল, হী—হী—হী! এই যে—এই যে সেই বর! বা রোসকে! তুই যে সেই বর! হী—হী—হী! সেই যে সেই ছোটবেলায়—তুই যখন খোকা ছিলি, আমি যখন খুকী ছিলেম, সেই সময় তোতে আমাতে বৌ বৌ খেলা কোরেছি, ঘোমটা দিয়ে তোর কাছে গিয়ে শুয়েছি, আপনার মুখে কাকের ডাক ডেকে দিনের বেলায় রাত পুইয়ে দিয়েছি, হাঃ—হাঃ—হাঃ! সে সব কি তুই ভুলে গেলি? আয় ভাই! আয়!—আয়, আয়—আয়! 'বাঁচি তো বসন্তকালে দেখা হবে আর বছর!' সে আর বছর কি এখনো এলো না? বছর না আসুক, তুই এসেছিস, হী—হী—হী! তোরে এরা ধোরে এনেছে, না তুই আপনি এসেছিস? আর ভাই!—প্রাণ যায়!—বুক যায়!—কে এনেছে?—সেই কোকিল পাখী?—সেই আমাদের পুকুরধারে, ঘাসবনের ভিতর লুকিয়ে লুকিয়ে, যে পাখীটি কুহু কুহু, গীত গাইত, সেই পাখী

কি তোরে ধোরে এনেছে? না ভাই! হী—হী—হী!—তা হবে না! আমি তোরে ছেড়ে দিব না! তোরেও ছাড়বো না, সেই পাখীও ছাড়বো না, ভালবাসার কি দুর্দ্দশা!—তোকে ভালবেসে আমার এই দশা!—হা—হা! সেই পাখীটিরও—ভাই রে নারে প্রাণপাখী!—হী—হী—হী!"

হী হী রবে হাসতে হাসতে পাগলীটা আমারে যেন আলিঙ্গন করবার জন্য ছুটে আসতে লাগলো, আমিও ছুটে পালালেম, পাগলীর দিকে আর ফিরে চাইলেম না; মনে কোল্লেম, এটা হয় তো প্রেমের পাগলিনী;— [...]

আর একদিন আর এক জায়গায় দুটি লোক আমি দেখি। একটা বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়িয়ে আমি তাদের অঙ্গভঙ্গী দর্শন কোত্তে লাগলেম। কত রকম ভঙ্গীই যে তারা দেখাচ্ছিল, বোলে জানানো যায় না। একজন একবার অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীর নখ-সংযোগে কি যেন উড়িয়ে দিলে, এইরূপ বোধ হলো; আবার বামকরতলে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাগ্র স্থাপন কোরে, জোরে জোরে কি বস্তু যেন পেষণ কোত্তে লাগলো, এইরূপ বুঝলেম। একটু পরে সেই লোক আবার উপরদিকে মুখ তুলে সশব্দে একটা কুৎকার দিলে, গীত গাইলে। গীতটা এই রকম—

"এসো গাজা আমার বারী, ও বাপধন!
ছাগোলে কামরালে সীতে, মোলো রাজা দুর্য্যোধন।
গোলাপফুলের পাপরী চিরে, দোক্তা ডাকে মাণিকপীরে,
হনুমানের মাথার কিরে, বলির আকাশে গমন।"

গীতের সুর থামতে না থামতে দ্বিতীয় লোকটা হাত দুলিয়ে দুলিয়ে, নূতন সুরে গাইতে লাগলো ঃ-

"আকাশে উঠিল চাঁদ তৃণবৎ হৈয়া,
হরবতী গায় গুণ হরের লাগিয়া, ভালা!
তোর এক কথা কেন? আক্কা—"

উভয়েরই শুধু হাত, সম্মুখেও কোন প্রকার উপকরণ ছিল না, কিন্তু হস্তভঙ্গীতে প্রক্রিয়া ঐরূপ, গীতও ঐরূপ। কি প্রকৃতির পাগল তারা, অনুমান কোরে নিতে আমার অধিক সময় লাগলো না। অনুমান কেন বলি, অঙ্গভঙ্গীর ভাবে আর গান-দুটির অর্থের ভাবে নিশ্চয় স্থির কোল্লেম, এ দুটো লোক গাঁজার পাগল। অনেক কারণেই অনেক লোক পাগল হয়। কোম্পানী বাহাদুরের দয়ার কার্য্য অনেক প্রকার। পাগলকে আশ্রয় দিবার জন্য—আরাম করবার জন্য স্থানে স্থানে বাতুলালয় আছে। বর্ষে বর্ষে ফলাফলের এক এক বিজ্ঞাপনী বাহির হয়। এক বৎসরের বিজ্ঞাপনীতে আমি পাঠ কোরেছিলেম, গাঁজার পাগল শতকরা ৭৩ জন। অপরাপর বহুবিধ কারণে অবশিষ্ট ২৭ জন পাগল। সরকারী হিসাবেই প্রকাশ পায়, আবকারীর অপরাপর পরিবারের মধ্যে গাঁজার পরাক্রম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। [...]

যেটি যে প্রকৃতির আশ্রম, সে আশ্রমে প্রায় সকল কার্য্যেই সেই প্রকৃতির খেলা হয়। সাহেবটি প্রস্থান করবার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে নেপথ্যে একটি সুর শ্রুতিগোচর হলো; বামাস্বর। সুরে বুঝলেম, বামাকণ্ঠে একটি গীত। সেই গীতটি গাইতে গাইতে একটি স্ত্রীলোক সে গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লে। চিতোরী নয়, নূতন স্ত্রীলোক। তার পশ্চাতে দুটি পুরুষ; অনাদি নয়, হিঙ্গন নয়, সাহেব নয়, দুটি নূতন লোক। লোক দুটি নির্ব্বাক। স্ত্রীলোকের মুখের এই গীত :—

"কবে আমার ফুটবে বিয়ের ফুল।
বিয়ের জন্যে ভেবে ভেবে পেটে হলো গুল্মশূল ॥"

মুখের সুর মুখেই থাকলো, স্ত্রীলোকটা আমার সম্মুখে জানু পেতে বোসে আমার গলদেশে একছড়া মালা পরালে; হস্তে, পদে, কটিদেশে শৃঙ্খল লাগালে; আবার গাইতে লাগলো—

"বেঁধে দিলাম প্রেম-শিকলে, বরমালা দিলাম গলে,
পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে, তোমায় দিলাম জাতিকুল ॥"

এই গীত গেয়ে সেই স্ত্রীলোক আমার সম্মুখ থেকে উঠে গেল; আমি বাঁধা পোড়লেম। জানছিলেম আমি বন্দী, বোলছিলেম আমি বন্দী, কিন্তু এতদিন বন্ধনদশায় বন্দী ছিলেম না, এই দিন সত্য সত্য বন্দী হোলেম!

লোক দুটি সেই স্ত্রীলোকের মোতায়েন হয়ে এসেছিল; যদি আমি কোন প্রকার হাঙ্গামা করি, লোকেরা আমারে ধোরবে, এই তাদের মতলব ছিল কিম্বা তাদের প্রতি ঐ প্রকার আদেশ ছিল। তাঁরা ইচ্ছা কোল্লে আপনারাই আমারে বেঁধে রেখে যেতে পাত্তো; কিন্তু তা তারা কোল্লে না, স্ত্রীলোকের হাত দিয়েই শিকল পরালে; পোরিয়েই তিনজনে একসঙ্গে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

আমি বাঁধা থাকলেম। শক্ত বন্ধন! বোল্লেম স্ত্রীলোক আমার গলায় মালা দিলে; মতির মালা নয়, ফুলের মালা নয়, লৌহমাল্য—অসূক্ষ্ম শৃঙ্খল! হস্ত-পদের শৃঙ্খলের সঙ্গে কটিদেশের শৃঙ্খল আবদ্ধ, কটিদেশের শৃঙ্খলের সঙ্গে গললগ্ন শৃঙ্খলের সংযোগ। সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি থাকলো না, পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকবারও স্বাধীনতা গেল! তখন আমি সম্পূর্ণ পরাধীন।

অরাজক উপদ্রব

পথে আসবার সময় একদিন আমরা একটা সরাইখানায় আশ্রয়গ্রহণ করি। সেই পান্থনিবাসে তখন অনেকগুলি লোক ছিলেন। কথায় কথায় তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। একজন আমাদের জিজ্ঞাসা করেন, "আপনারা কোথায় যাবেন?" দীনবন্ধুবাবু উত্তর দেন, "কলিকাতায়।"

যিনি জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন, তিনি বাঙালী; আলাপ-পরিচয়ে বুঝা হয়েছিল, লোকটি অতি ভদ্র। আমরা কলিকাতায় আসবো, সেই কথা শুনে একটু চিন্তা কোরে, তিনি বোল্লেন, "সাবধান, সাবধান!—পথ আজকাল বড় দুর্গম! লক্ষ্ণৌয়ের দিক দিয়ে যাবেন না; লক্ষ্ণৌ আজকার মহা বিপদক্ষেত্র! কোম্পানীর পলটনের সমস্ত সিপাহীই ক্ষেপে উঠেছে! সমস্ত শ্বেত মনুষ্য নির্ম্মূল করা তাদের সংকল্প! যদিও বাঙালীর উপর তাদের কোপ নাই, যদিও বাঙালীকে তারা শত্রু মনে করে না, কিন্তু বিশ্বাস কি? এখন তারা মোরিয়া। কোম্পানীর দলে যারা যারা থাকে, অনুদেশী হোলেও উন্মত্ত সিপাহীরা সহজেই তাদের ছেড়ে দিবে, এমন বোধ হয় না; অনেক বাঙালী ইংরেজ কোম্পানীর চাকরী করে; চাকরীর খাতিরে তারা হয় তো গুপ্তচরের কার্য্য কোত্তে পারে, সেই সন্দেহে বাঙালীর উপরেও তাদের নজর আছে। আপনারা লক্ষ্ণৌয়ের পথে যাবেন না!"

দীনবন্ধুবাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সে কি মহাশয়? অকস্মাৎ এমন কাণ্ড কেন ঘোটলো? অনেক দিন আমরা তীর্থভ্রমণ কোচ্ছি, এ কথা তো কোথাও শুনি নাই; সিপাহীরা অকস্মাৎ সাহেবের উপর ক্ষেপে উঠলো কেন? সাহেবের বেতনভোগী বিশ্বাসী সৈন্য তারা, সাহেবের মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিতেও তারা প্রস্তুত, অনেক যুদ্ধে অনেক সিপাহী প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েওছে, এ দেশী সিপাহীর বীরত্বে সাহেবেরা এদেশের অনেক যুদ্ধে জয়লাভ কোরেছেন, তাদৃশ প্রভুভক্ত সিপাহীরা অকস্মাৎ সাহেবের শত্রু হয়ে উঠেছে, হেতু কি?"

ভদ্রলোকটি বোল্লেন, "হেতু বড় অদ্ভুত! পলটনে এত দিন যে সকল বন্দুকের ব্যবস্থা ছিল, সে সকল বন্দুকের বদলে সাহেবেরা সম্প্রতি নূতন এক প্রকার বন্দুকের সৃষ্টি কোরেছেন; সে বন্দুকের নাম রাইফেল বন্দুক; আওয়াজ করবার সময় সেই সকল বন্দুকে চর্বী-সংযুক্ত টোটা ব্যবহার করা হবে, এই প্রকার এক জনরব। জনরবটা সত্য কি মিথ্যা, ঈশ্বর জানেন, কিন্তু কলিকাতার নিকটবর্তী দমদমার বারিকের সিপাহীরা কার মুখে কি প্রকারে সেই জনরবটা শুনতে পায়, শুনেই এককালে জাতিনাশের ভয়ে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠে। হিন্দু মুসলমান এককাট্টা। উভয় জাতিই একসঙ্গে ক্ষিপ্ত হবার হেতু এই যে, জনরবে প্রচার, হিন্দুর ব্যবহার্য্য টোটায় গাভীর চর্ব্বী আর মুসলমানের ব্যবহার্য্য টোটায় শূকরের চর্ব্বী মিশ্রিত থাকবে, আওয়াজের সময় সেই সকল টোটা সিপাহীগণকে দন্ত দ্বারা ছেদন কোত্তে হবে। এই এক কথা। দ্বিতীয়তঃ হিন্দু মুসলমানের আহার্য্য রুটীর আটাতে শূকরের অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত করা হোচ্ছে, এটাও এক জনরব। এই দুই কারণেই দুই জাতি সিপাহীই কোম্পানীর উপর ভক্তিশূন্য! ভয়ঙ্কর ব্যাপার! প্রথমে দমদমায়, তারপর বারাকপুরে অশান্তির উৎপত্তি। দাবানল যেমন বায়ুসংযোগে প্রবল হয়ে দূরদূরান্তের অরণ্যে অরণ্যে প্রজ্বলিত হয়, এই অশান্তিহুতাশনও সেইরূপে চতুর্দ্দিকে প্রবল হয়ে উঠেছে। বারাকপুরের পর এককালে মিরাটে মহাবিদ্রোহ! ক্রমশঃ বারাণসী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে প্রবল-স্রোতে নরশোণিত প্রবাহিত হোচ্ছে। খবরদার, আপনারা লক্ষ্ণৌয়ের পথে যাবেন না। আমরা শুনেছি কানপুর এখনও ঠাণ্ডা আছে; আপনারা অন্য পথ দিয়ে ঘুরে শীঘ্র শীঘ্র কানপুরে গিয়ে উপস্থিত হোন, কানপুরের গঙ্গায় তরণী আরোহণে গন্তব্য স্থানে গমন করুন; বোধ হয়, সে পথে

কোনপ্রকার বিপদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হোতে পারে।"

শুনে আমাদের মনে মহাভয়ের সঞ্চার হলো; ভয়ে ভয়ে উদ্বেগে উদ্বেগে সেই সরাইখানায় আমরা সে রাত্রি অতিবাহিত কোল্লেম; পরদিন প্রভাতে আমাদের কানপুর যাত্রা। সেই ভদ্রলোকটির পরামর্শানুসারে আমরা ক্রমাগত বক্র বক্র পথেই যেতে লাগলেম। তিন দিন পরে আমরা একটি স্থানে উপস্থিত হোলেম, স্থানের নাম কল্যাণপুর। সেখানকার কোন কোন লোককে জিজ্ঞাসা কোরে জানা গেল, ব্যাপার বড় ভয়ঙ্কর। যদিও কানপুরে এখনো বিদ্রোহানল প্রবল হয়ে প্রজ্বলিত হয় নাই, কিন্তু আর বড় বিলম্বও নাই। একদিন আমরা কল্যাণপুরে থাকলেম; একদিনের জন্যই নূতন বাসা। সেই বাসাতে একটি বৃদ্ধ লোক ছিলেন, রাত্রিকালে নির্জ্জনে দীনবন্ধুবাবু তাঁরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "একটা জনরবের উপর বিশ্বাস কোরে সিপাহীরা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, সাহেবেরা কি তাদের শান্ত করবার নিমিত্ত কোন উপায় অবলম্বন কোচ্ছেন না?"

বৃদ্ধ উত্তর কোল্লেন, "শান্ত করবার চেষ্টা দূরে থাক, আত্মরক্ষার ব্যপদেশে তাঁরা বরং আরো প্রধূমিত অনলে আহুতি দান কোত্তে আরম্ভ কোরেছেন। উভয় পক্ষই মোরিয়া গ্রামদাহ, পল্লীদাহ, অনবরত গোলাগুলীবৃষ্টি, চতুর্দ্দিকে নররক্তপাত, হুলস্থুল কাণ্ড! কেহই প্রায় নিরাপদ নয়। তবে বাঙ্গালীর প্রতি বিশেষ কোন অত্যাচারের সমাচার আমরা শুনি নাই।"

বৃদ্ধের মুখে আরো ভয়ানক ভয়ানক কথা আমরা শুনলেম; পথে আসবার সময় স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ ভস্মস্তূপ দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, সেই সকল স্তূপ ঐ প্রকার গৃহদাহের সাক্ষী, এইরূপ আমাদের বিশ্বাস দাঁড়ালো, ক্রমশই ভয় বাড়তে লাগলো [...]। উষাকালে কি একটি কথা স্মরণ কোরে দীনবন্ধুবাবু আমাদের বোল্লেন, "আর এখানে থাকা কর্ত্তব্য নয়, প্রভাত হবার অগ্রেই এস্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।" [...]

এই প্রকার লোমহর্ষণ কাণ্ডের সমাচার আমরা শ্রবণ কোল্লেম। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ত্রয়োবিংশ দিবস। সে দিন আমরা নবাবগঞ্জেই অতিবাহিত কোল্লেম, পরদিন ২৪-এ মে) মহারাণী ভিকটোরিয়ার জন্মদিন। সেনাপতি হুইলর সেই উৎসবদিবসে দস্তুরমত তোপধ্বনি বন্ধ কোরে দিলেন, কোন প্রকার বাহ্যাড়ম্বরে উৎসবের অনুষ্ঠান হলো না, সকলেই নীরবে মুহ্যমান অবস্থায় মহারাণীর জন্মোৎসবের দিবা-রজনী যাপন কোল্লেন। সেই উৎসবে সকলেই স্ফূর্ত্তিশূন্য। [...]

গঙ্গার দক্ষিণতীরে কানপুর। [...] মোগলাধিকার সময়ে কানপুর নাম প্রকাশ; তদবধি কানপুর একটি বাণিজ্যবন্দর হয়ে উঠে; সেই কানপুরে এই সময় ঐরূপ মহাবিপ্লব! আমরা স্বচক্ষে উভয় পক্ষের ভীষণতর কাটাকাটি রক্তারক্তি দর্শন করি। [...] গঙ্গার সতীচৌরঘাটে সাহেব যাত্রীদের জন্য নৌকা প্রস্তুত হয়েছিল;—চল্লিশখানা নৌকা। খানকতক নৌকার ছত্রী প্রস্তুত ছিল, বাকী কয়েকখানার জন্য নূতন ছত্রী প্রস্তুত হোচ্ছিল। সাহেব-বিবিরা দলে দলে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হোচ্ছিলেন, আমরাও সেই সময় আর এক ঘাটে আর একখানা নৌকা ভাড়া কোরে প্রস্থানের নিমিত্ত প্রস্তুত হই। সাহেবদের সমস্ত নৌকার ছত্রী সজ্জিত হবার পর, তাঁরা স্ত্রী-পুত্রাদি সমভিব্যাহারে সেই সকল নৌকায় আরোহণ করেন; আমরাও আমাদের নৌকায় আরোহণ করি। [...]

গোলাপ হাতে বাবু, কালিঘাটের পট, উনিশ শতক

যে স্থানে আমাদের নৌকা সে স্থান থেকে সতীচৌরঘাট বেশ দেখা যায়। সাহেব-বিবিরা আরোহণ কোল্লেন, শ্রেণীবদ্ধ হয়ে তাদের নৌকাগুলি গঙ্গার জলে ভাসলো, তফাৎ থেকে আমরা দর্শন কোল্লেম। গঙ্গায় তখন অধিক জল ছিল না; ঠাঁই ঠাঁই বড় বড় চড়া; চোলতে চোলতে এক একখানা নৌকা চড়ায় ঠেকে আটকে আটকে যায়, মাঝি-মাল্লারা ঠেলাঠেলি কোরে আবার ভাসায়; এই প্রকার গতি। আমাদের নৌকাখানি তখনো ছাড়া হয় নাই। সাহেবদের নৌকা খানিক দূর গিয়েছে, আর কোন ভয় নাই বিবেচনা কোরে আরোহীরা এক প্রকার আশ্বস্ত হয়েছেন তীরে জনকতক দর্শক দাঁড়িয়ে ছিলেন, তারাও আশ্বস্ত, এমন সময় একদল সিপাহী হঠাৎ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে নৌকার উপর গুলীবর্ষণ আরম্ভ করে। ধূমে ধূমে ধূমাকার! নৌকার ভিতর পরিত্রাহি চীৎকার! রক্তস্রোতে গঙ্গা অনেকদূরে পর্য্যন্ত রক্তবর্ণ দেখাতে লাগলো। [...] আর রক্ষার উপায় নাই, সব যায়, এই বিপদসময়ে গঙ্গাজলে সাঁতার দিতে দিতে গুটীকতক বিবি আর দুটি সাহেব আশ্রয়প্রাপ্তির আশায় আমাদের নৌকায় এসে উঠলেন। আমরা বাঙালী, আমাদের কাছে তাদের বিপদের আশঙ্কা ছিল না, সেটি তারা জানতে পেরেছিলেন, আমরাও যত্নপূর্ব্বক আশ্রয় দিয়েছিলেম। [...] অন্ধকারে রণোন্মত্ত সিপাহীরা হয় তো তাদের দেখতে পেলে না কিম্বা আমাদের নৌকা দূরে ছিল, বাঙালীর নৌকা, কতিপয় সিপাহী একবার সেখানে আমাদের দেখেও গিয়েছিল; সুতরাং সে দিকে আর তারা ততটা লক্ষ্য রাখলে না; আশ্রয়ার্থীরা এক প্রকার নির্ব্বিঘ্নে আমাদের নৌকায় আশ্রয় পেলেন। সিক্তবস্ত্রে বিবিগুলি কম্পিতকলেবরা, সাহেবরাও কম্পিত। কম্পের দুই কারণ;—শীত আর ভয়।

দুই বস্তা কাপড় আমাদের সঙ্গে ছিল [...]। ভালই হলো। বিলাতী পোষাকে কোন গতিকে ধরা পড়বার আশঙ্কা, সেই আশঙ্কা-নিবারণের আশায়

প্রত্যুৎপন্নমতিপ্রভাবে দীনবন্ধুবাবু ধুতি-চাদর ও শাড়ী পোরিয়ে সেই আশ্রিত সাহেবগুলিকে বাঙালী সাজালেন। [...] নৌকা বিপরীত দিকে চোল্লে। ওদিকে সাদায় কালোয় মহাযুদ্ধ; গোলাগুলী বর্ষণ কোত্তে কোত্তে তারা আমাদের চক্ষের অদৃশ্য হয়ে গেল।

উপসংহার

ইহসংসারে ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটি পন্থা। ধর্ম্মপথে বিচরণ কোরে কিরূপ ফল হয়, অধর্ম্মপথে ভ্রমণের কিরূপ পরিণাম, আমার এই জীবনকাহিনীতে কথায় কথায় সেগুলি আমি দেখালেম। এইখানে আমার জীবনের আখ্যায়িকা সমাপ্ত হবার কথা, কিন্তু পাঠকমহাশয় আর কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করুন। আর অতি অল্পমাত্র কথা আমার বলবার আছে। ১২৬৬ সালে আমার বিবাহ, ১২৬৯ সালে আমার প্রথম পুত্রের জন্ম। ১২৭২ সালে দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম। ১২৭৩ সালে কন্যাটির জন্ম। জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম শরৎকুমার, দ্বিতীয়ের নাম ললিতকুমার, কন্যাটির নাম অমলকুমারী। বঙ্গদেশে বাল্যবিবাহের বিরোধী আমি নই, ১২৮২ সালে নবমবর্ষীয়া অমলকুমারীকে আমি যোগ্যপাত্রে সমর্পণ কোল্লেম, ১২৯২ সালে শরৎকুমারের, তৎপরে ১২৯৫ সালে ললিতকুমারের বিবাহ দিলেম। এখন ১৩১০ সাল। শরৎকুমারের বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর। শরৎকুমারের দুই পুত্র এক কন্যা। ললিতকুমারের বয়ঃক্রম ৩৮ বৎসর। ললিতের এক পুত্র এক কন্যা। অমলকুমারীর কেবল একটিমাত্র পুত্র, কন্যা হয় নাই।

সংসারের সকলেই পরম সুখী। আমি মধ্যে মধ্যে নানাস্থান পরিভ্রমণ করি। মুর্শিদাবাদের যদুপুরে আমাদের দেবালয়াদি প্রস্তুত হয়েছিল, শাস্ত্রানুসারে সেইগুলি আমি প্রতিষ্ঠা কোরেছি, ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারণ কোরে দিয়েছি, সে পক্ষে আর আমার কোন উদ্বেগ ছিল না। কার্য্যানুরোধে কয়েকমাস আমি কলিকাতায় অবস্থান করি; পরগৃহে নয়, বাহির-মির্জ্জাপুরে আমার নিজ বাড়ীতেই আমি থাকলেম। একমাস থাকতে থাকতেই অনেক লোকে আমার নাম শুনতে পেলো, নিত্য নিত্য প্রায়ই দুজন পাঁচজন ভদ্রসন্তান আমার বাড়ীতে আসতে লাগলেন। যাঁর যেরূপ প্রকৃতি তদনুসারে তিনি আমার সহিত ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা কোত্তে লাগলেন। আমি তাঁদের সকলের ব্যবহারে তুষ্ট হোতে পাল্লেম না। কেহ কেহ আমায় অযথা তোষামোদ করেন, কেহ কেহ আমারে দাতা কল্পতরু বলেন, কেহ কেহ বন্দীর ন্যায় আমার গুণকীর্ত্তন কোরে নিজের স্বার্থসিদ্ধির পন্থা দেখেন। অনেকেরই কপটতা আমি বুঝতে পারি। [...]

মফস্বলের কোন ধনবান লোক কলিকাতায় এসে উপস্থিত হোলে অনেক রকমের ধান্দাবাজ লোক অনেক রকমের চাঁদার খাতা হাতে কোরে সাহায্যলাভের জন্য তাদের কাছে উপস্থিত হয়; আমার কাছেও সেই রকমের লোক অনেক আসে। যে যে স্থানে সাহায্য করা আমি আবশ্যক বিবেচনা করি, সেই সেই স্থানে সম্ভবমত দান করি, যেখানে কোন প্রকার প্রতারণা

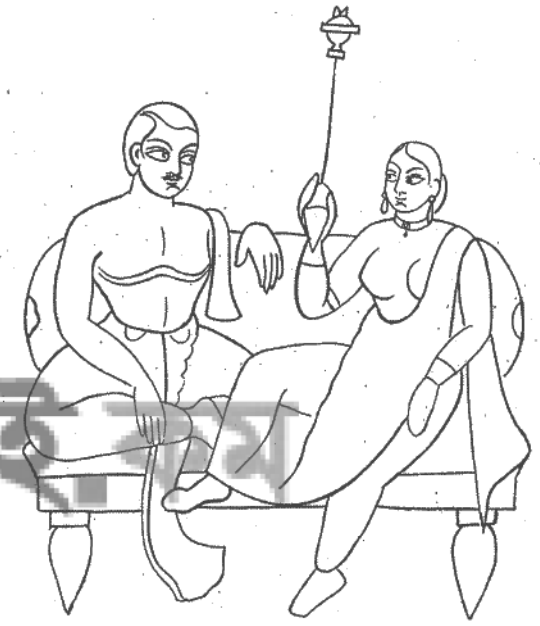

বাবুবিলাস, উনিশ শতক

বুঝা যায়, সেখানে আমি মৌনাবলম্বন কোরে থাকি। মণিভূষণ বিদায় হবার একমাস পরে একদিন একটি বাবু এলেন। সাহেবলোকের মত হ্যাট-কোট-প্যান্টুলেন, বুকে শৃঙ্খলবদ্ধ সোনার ঘড়ি, চক্ষে সোনার চশমা, মুখে চুরুট, দীর্ঘ দীর্ঘ গোঁফদাড়ী। মুখের আকার দেখে লোকটিকে আমি 'বাবু' বোলে চিনলেম, নতুবা সহজে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সমাদর কোরে আমি তাঁরে বসালেম, নামধাম জিজ্ঞাসা কোল্লেম। লোকটি তাঁর নাম বোল্লে, "এচ. বাসু; নিবাস বঙ্গদেশ।"

"কি অভিপ্রায়ে আগমন", আমি তাঁরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম। দীর্ঘ এক বক্তৃতা কোরে তিনি উত্তর কোল্লেন, "স্বগ্রামে একটি ব্রহ্মসভা, একটি বালিকাবিদ্যালয় আর একটি সমাজ-সংস্কারিণী সভা সংস্থাপন করা হয়েছে, আপনার তুল্য বড় লোকেরা সাহায্য দান কোরেছেন, আপনার নিকটেও কিছু সাহায্য প্রার্থনা।"

প্রার্থনা এইটুকু, কিন্তু বক্তৃতা বিশাল। বক্তৃতার তাৎপর্য্য এইরূপ যে, "আজকাল সকল দিকে সকল বিষয়ে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি; ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি, বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি এবং সমাজেরও শ্রীবৃদ্ধি। ইংরেজের রাজত্বে ভারতের মঙ্গল, ভারতের মঙ্গলের নিমিত্তই ভারতে ইংরেজদের আগমন। যত দিকে যত কিছু উন্নতি দৃষ্ট হোচ্ছে সমস্তই ইংরেজের প্রসাদে, ইংরেজের প্রসাদেই আপনারা ধনবান, ইংরেজের প্রসাদেই আপনারা বিদ্যাবান, ইংরেজের প্রসাদেই আপনাদের সম্মানলাভ। দেশের উপকারে আপনা মুক্তহস্ত হন, উন্নতিকামুক ইংরেজ বাহাদুরের এইরূপ ইচ্ছা।"

একটিও উত্তর দান করা আমার ইচ্ছা ছিল না, তথাপি দুই একটি উত্তরদানে আমি বাধ্য হোলেম। বক্তার মুখপানে চেয়ে প্রথমে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "উন্নতি আপনারা কাহাকে বলেন? এদেশে ইংরেজি চর্চ্চার আধিক্য হয়েছে, একথা স্বীকার্য্য; কেবল সেইটিই যদি উন্নতির নিদর্শন হয়, তবে আপনার কথাগুলিই ঠিক; নতুবা আর কোন প্রকৃত উন্নতি আমি বুঝতে পাচ্ছি না। ধর্ম্মের উন্নতি! আপনারা যাকে ধর্ম্মের উন্নতি বলেন, আমার মতের সহিত তার ঐক্য হয় না। সনাতন আর্য্যধর্ম্মের পবিত্রতা আপনারা ডুবিয়ে দিবার চেষ্টায় আছেন, দেশের আচার-ব্যবহার আপনারা উল্টে দিবার চেষ্টায় আছেন; যেগুলি এদেশের ধর্ম্ম, সেগুলিকে আপনারা বলেন কুসংস্কার। আপনাদের ব্রহ্মসভা ব্রহ্মনিরূপণে অক্ষম; বিশেষতঃ রাজা রামমোহন রায় যে উদ্দেশে, যে মূলের উপর নির্ভর কোরে, কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন কোরেছিলেন সে উদ্দেশ্য এখন বিফল, সে মূল এখন বিপর্য্যস্ত; ব্রহ্মজ্ঞান যেন এখন বাজারের পণ্যবস্তু—বালকের ক্রীড়ার বস্তু। হিন্দু-সমাজের আচার-ব্যবহার আজকাল স্বেচ্ছাচারে পরিণত। আপনারা জাতিভেদ মান্য কোত্তে চান না, হিন্দুর খাদ্যাখাদ্য বিচার কোত্তে চান না, জাতীয় পরিচ্ছদকে আপনারা ঘৃণা করেন, স্ত্রীজাতির সতীত্ব আর লজ্জাশীলতাকে আপনারা বিদায় দিতে চান। স্ত্রীস্বাধীনতার আদর করেন না। আমি বোধ করি, স্ত্রীস্বাধীনতা একটা কিছু অদ্ভুত জিনিস নয়। স্ত্রীজাতির ভূষণ লজ্জা, সেই লজ্জা পরিত্যাগ কোত্তে পাল্লেই এ দেশের স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন হয়; স্ত্রীলোকের সেই স্বাধীনতায় সমাজ-সংস্কার অধঃপাতে যায়! এইগুলি আপনাদের উন্নতি। আর একটি উন্নতি, অসবর্ণ বিবাহ। সেরূপ বিবাহে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি। হায়! মানী লোকের বংশমর্য্যাদা বিলুপ্ত হবে, উত্তরোত্তর বিবিধ পাপের শ্রীবৃদ্ধি হবে, সেটি আপনারা ভাবেন না। আপনাদের উন্নতির তালিকার যে অংশে নেত্রপাত করা যায়, সেই অংশেই যেন এক

একটা বিভীষিকা মূর্ত্তিমতী হয়ে আর্য্যসমাজকে ভয় প্রদর্শন করে। আপনি আপনাদের গ্রামে ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা কোরেছেন, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, সমাজসংস্কারিণী সভা প্রতিষ্ঠা কোরেছেন, শুনতে খুব ভাল; কিন্তু যে প্রণালীতে আজকাল ঐ তিনকার্য্য সাধিত হয়, তাতে কোনপ্রকার বিশেষ উন্নতির আশা নাই।" এই পর্য্যন্ত বোলে সেই লোকটিকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনি কি কেবল ঐ তিনটি সদনুষ্ঠানের চাঁদা সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় এসেছেন কিম্বা কলিকাতায় আপনার থাকা হয়?" তাচ্ছিল্যভাবে মুখে চুরুটে ধূম উদ্গীরণ কোরে, গাম্ভীর্য্য দেখিয়ে তিনি উত্তর কোল্লেন, "কলিকাতাতেই থাকা হয়।" পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কলিকাতায় আপনি কি কাজ করেন?" পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভঙ্গীতে কিঞ্চিৎ দাম্ভিকতা প্রকাশ কোরে তিনি বোল্লেন, "কথ বার্টশন হারপার কোম্পানীর বাড়ীতে আমি হেড ক্লার্কের কাজ করি।"

অন্তরে ঘৃণা, মুখে অল্প অল্প হাস্য আনয়ন কোরে তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম, "এই দেখুন, মুচির বাড়ীতে চাকুরী কোরে আপনি সমাজ সংস্কারের মুরুব্বী হতে চান। এটা কত বড় আশ্চর্য্য কথা। আপনার মত লোকের দ্বারা সমাজের উন্নতি এক প্রকার বিড়ম্বনা।" আমার ঐ কথা শ্রবণ কোরে, লোকটি চঞ্চল হস্তে আপনার দীর্ঘ শ্মশ্রুতে ঢেউ খেলাতে লাগলেন। পাছে কথায় কথায় কথা বাড়ে, সেই সন্দেহে আর কোন কথা আমি উত্থাপন কোল্লেম না। গৃহাগত সাহায্যার্থীকে রুক্ষ হস্তে বিদায় করা নিষ্ঠুরতা, অতএব দশ টাকার একখানি নোট তাঁর হস্তে আমি অর্পণ কোল্লেম। অপমানের ভয়ে শিষ্টাচার বিস্মৃত হয়ে গম্ভীরবদনে দ্রুতপদে তিনি প্রস্থান কোল্লেন। অপমানের ভয়ে শিষ্টাচার বোধ হয় তাদৃশ লোকের কাছে অগ্রসর হয় না।

লোকটি বিদায় হবার পর অনেক কথা আমার মনে উদয় হলো। দেশের উন্নতির নামে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! বঙ্গবাসীর অঙ্গে সাহেবী পরিচ্ছদ! নাম শুনলেম, এচ. বাসু, কথা শুনলেম শ্লাঘামূলক! চাকরী শুনলেম, মুচির বাড়ী; এই প্রকৃতির লোক কলিকাতায় আজকাল অনেক। সাহেবী পরিচ্ছদে বাঙালীর সন্তানকে কেমন দেখায়, বোধ করি, তাঁরা দর্পণাগ্রে দণ্ডায়মান হয়ে নিজ নিজ মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব দর্শন করেন না। কেবল পরিচ্ছদেও নয়, আহারবিহারাদি প্রায় সকল বিষয়েই সাহেবী অনুকরণে তাঁরা উন্মত্ত। দাড়ী-চসমা ধারণ ব্রাহ্মধর্ম্মের নিদর্শন, অন্য কথায় সভ্যতার চিহ্ন। একজন কবিরত্ন একটি গীত রচনা কোরেছিলেন, লক্ষ্য ছিল বঙ্গযুবকদের দাড়ী-চসমার উপর। গীতটি অতি চমৎকার।

গীতটি এই রকম;—

"চাঁপদাড়ী রাখা, চোকে চসমা ঢাকা,
ভয়ানক ঢং চেগেছে বাংলাতে।
চেনা যায় না এখন হিন্দু মুসলমান
আকার অবয়বে ঠেকে সব সমান,
বাঁড়ুয্যে কি রশুলবক্স মিঞাজান,

বাবু ও বিবি

অনুমান করা কঠিন এক্ষণেতে ॥"

আজ্ঞাভিমানী উন্নতিশীল বাঙালীচিত্র অনেকাংশে ঠিক ঐরূপ, আসল কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ অল্প; অনুকরণে বাহ্যাঙ্গের শোভাই সভ্যতার পরিচায়ক। কলিকাতার রাজপথে বহির্গত হোলেই বাহ্যশোভাবিশিষ্ট শত শত বঙ্গযুবা নেত্রগোচর হয়। পূর্ব্বে আমি বারকতক এই কলিকাতা-নগরী দর্শন কোরে গিয়েছি, এখন দেখি যেন অনেক নূতন বাড়ী, গাড়ী, রাস্তা, বেশ্যা, বাবু, সমস্তই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, আর্য্যধর্ম্মের সম্মান-গৌরব এখন যেন অনেকের মুখে উপহাসে পরিণত। বক্তা অনেক, সভা অনেক, সভায় সভায় বক্তৃতার ঘনঘটায় আকাশ পর্য্যন্ত কম্পমান; বক্তৃতার সঙ্গে কাজের মিলন অতি অল্প। দেশের কিম্বা বিদেশে কোন একজন বড়লোকের মৃত্যু হোলে, বঙ্গযুবকেরা এক এক সভা আহ্বান কোরে, দশজনে জড় হোয়ে একসঙ্গে ক্রন্দন করেন। সে সকল সভার নাম শোকসভা; ক্রন্দনচ্ছলে বক্তৃতা! "কাঁদো, স্মরণচিহ্ন রাখো, পরিবারের নিকট সান্ত্বনাপত্র পাঠাও, চাঁদা কর," সভায় সভায় এই সকল কার্য্য হয়, ফলে কি দাঁড়ায় সকল সময় সকলে সেটি জানতেও পারেন না।

কালমাহাত্ম্যে কলিকাতায় এখন কেবল বাহ্যাড়ম্বর। সমস্তই অনুকরণের ফল। মুসলমান রাজত্বকালে এদেশের লোকেরা রাজভাষা-গৌরবে আরবী পারসী অধ্যয়ন কোত্তেন, কোন কোন সৌখীন লোক মুসলমানী কেতায় টুপীচাপকান ব্যবহার কোত্তেন, মোগলাইখানার সৌরভে কাহার কাহার রসনা রসবতী হয়ে উঠতো; কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে সাধারণতঃ মুসলমানী অনুকরণের এত ধুমধাম ছিল না; এখন কেবল আচারানুষ্ঠানে পাশ্চাত্যানুকরণের একাধিপত্য।

বাঙালীরা কারবার জানে না, কেবল চাকুরী জানে, এই একটা দুর্নাম ছিল; এখন সেই দুর্নামমোচনের অভিলাষে বাঙালী সন্তানেরা এক একটা কারবারের নামে এক একটা দোকান খুলে বোসছেন, দোকানে দোকানে এক এক সাইনবোর্ড ঝুলছে। সব সাইনবোর্ডে প্রায় দোকানদারের নামের সঙ্গে "এণ্ড কোং" জোড়া। বাঙালীরা কোম্পানীবদ্ধ হয়ে কাজ কোত্তে জানেন, ঐ এণ্ড কোং শব্দ তারি পরিচয় দেয়। [...]

[...] কলিকাতার হুজুগ অনন্ত। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে চিৎপুর সারস্বতাশ্রমের বৃক্ষবাসী হুতুম প্যাঁচা মিষ্ট বচনে বোলেছিলেন :—

"আজব সহর কোলকেতা!
হেথা, ঘুঁড়ে পোড়ে, গোবর হাসে
বলিহারি একতা!
বকবিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদমায়েসীর
ফাঁদ পাতা ॥
রাঁড়ীবাড়ী জুড়ীগাড়ী, শুঁড়ী
সোনারবেনের কড়ি,
খানকী খেমটি খাসা বাড়ী,
ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা ॥
হুতুম দাসে, স্বরূপ ভাষে,
তফাৎ থাকাই সার কথা ॥"

ঐ ধূয়ায় আমিও মনে মনে স্থির কোল্লেম, তফাৎ থাকাই সার কথা, বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ কলিকাতা সহরে আর আমার বাস করা উচিত হয় না। জীবনের প্রথমকাল অজ্ঞাতবাসে অতীত হয়েছে, মধ্যাবস্থা সাংসারিক বিষয়কার্য্যে অতিবাহিত হলো, শেষ অবস্থায় অর্থচিন্তার অবসর। এ সময় কলিকাতা সহরের ভোগবিলাসপূর্ণ নূতন নূতন হুজুগের বাজারে আমি শান্তিলাভ কোত্তে পারবো না। সহরের দৃষ্টান্তে প্রদেশে প্রদেশেও বিস্তার বাহ্যাড়ম্বর শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে; অধিকন্তু যে উদারহৃদয়া ভাগ্যবতী পুণ্যবতী রমণীর আশ্বাসে আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ সুরক্ষিত হয়ে আসছিল, কালস্বরূপ ১৯০২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আমাদের সেই জননীস্বরূপিণী ভিক্টোরিয়া স্বর্গারোহণ কোরেছেন। এখন পবিত্র আর্য্যধর্ম্ম—আর্য্যসমাজ কি অবস্থা প্রাপ্ত হবে, মনে চিন্তা কোল্লেও ভয় হয়। এই সকল স্মরণ কোরে আমি ভাবলেম, বঙ্গদেশে আমার মত লোকের আর শান্তি নাই, মুক্তিক্ষেত্র বিশ্বেশ্বরক্ষেত্রে প্রস্থান কোরে পরমার্থচিন্তায় কালহরণ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

সংকল্প স্থির কোরে আমি বর্দ্ধমানে যাত্রা কোল্লেম; সেখানে দুটি পুত্রের প্রতি বিষয়কার্য্যের ভারার্পণ কোরে, বহুদর্শী দেওয়ানজীকে অভিভাবক রেখে, জননী, মাতামহী, কাকিমা আর অমরকুমারী সমভিব্যাহারে আমি বারাণসী ধামে গমন কোল্লেম। চরমকাল পর্য্যন্ত কাশীবাসী হয়েই থাকবো, এইরূপ আমার অভিলাষ। পাঠকমহাশয়! এইখানে আমার জীবকাহিনী সমাপ্ত। কাহিনীর বর্ণনায় কোন অংশে কোন প্রকারে যদি আপনাদের কিছুমাত্র চিত্তরঞ্জন কোত্তে পেরে থাকি,—ধর্ম্মের পুরস্কার, অধর্ম্মের প্রতিফল যদি আমি কোন অংশে বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হয়ে থাকি, তবেই আমার সমস্ত শ্রম সুফল। দয়া রাখবেন, অনুগ্রহ রাখবেন, স্মরণ রাখবেন, আমি আপনাদের চিরানুগত, চিরানুগৃহীত, ধর্ম্মদাস—হরিদাস।